আমার জীবন

(চেখভ)

অনুবাদক

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

সমবায় পাবলিশার্স
কলিকাতা

মজুমদার পাব্লিশার্স, ১১,২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ভিক্টরী কোম্পানী, ১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
হরিপদ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

আমার জীবন
(চেখভ)

'আমার জীবন' চেখভের বিখ্যাত ও বিশিষ্ট উপন্যাস। সম্ভ্রান্ত জীবনের মিথ্যা মানমর্যাদার বিরুদ্ধে বিরাট বিদ্রোহ নিয়ে এই গ্রন্থের সুরু; স্বাধীন শ্রমগৌরবে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা ক'রে সাধারণের সংগে মিলিত হয়ে থাকাই জীবনের সার্থকতা—এখানেই গ্রন্থের পরিণতি। বিজ্ঞ রসজ্ঞদের মতে 'আমার জীবন' চেখভের গতিশীল ও গঠনমূলক শ্রেষ্ঠ রচনা।............

রুশ সাহিত্য অধ্যয়নে অনুরাগ ও অনুবাদ-সাহিত্যে আমার উৎসাহের মূলে প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে সোভিয়েট সুহৃদসংঘ ও বিখ্যাত অনুবাদিকা মিসেস কন্‌ষ্টান্‌স গার্ণেট্‌ অনূদিত রুশ-গ্রন্থাবলী। একথা এখানে উল্লেখ ক'রে আনন্দবোধ করছি। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন আমার জ্যেষ্ঠোপম শ্রীযুক্ত হরিসাধন ঘোষ এবং বইটিকে শোভন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছেন বন্ধুবর মহাদেব সরকার। এঁদের কাছে আমি প্রীতিপাশে আবদ্ধ রইলাম।

বড়দিন—১৩৫২ ১০/১ চক্রবেড়ে রোড সাউথ, ভবানীপুর।	**অনিলেন্দু চক্রবর্তী**

সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হ'লেও অক্লান্ত শ্রম ও
একান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন
ছিল যাঁর অকুণ্ঠ আদর্শ
আমাদের সেই পরলোকগত পিতার
ব্যথাতুর স্মৃতির উদ্দেশে—

আমার জীবন

(এক)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—"তোমাকে কাজে রেখেছি শুধু তোমার বাবার সম্মানের খাতিরেই, নইলে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দিতাম অনেকদিন আগেই।"

ধীরে ধীরে উত্তর দিলাম,—"আমার ঘাড়ও যে আপনার ধরবার যোগ্য এতেই আমি খুব ধন্য বোধ করছি।" অমনি গর্জে উঠলেন তিনি,—"লোকটাকে বের ক'রে দাও তো, একে দেখলেই আমার সর্বাংগ জ্ব'লে ওঠে।"

দু'দিন পরেই চাকরী থেকে বরখাস্ত হলাম এবং এইভাবেই আমার এই বাড়ন্ত বাইশ বছরের মধ্যে বরখাস্ত হয়েছি একে একে ন'টা চাকরী থেকে, আজ হয়ে দাঁড়িয়েছি বাবার মর্মান্তিক আফশোষের কারণ। সরকারী বিভাগেও কাজ ক'রে দেখেছি, কিন্তু সর্বত্রই সমান: ব'সে ব'সে বড়োবাবুদের অসংগত অভদ্র মন্তব্য মুখ বুজে হজম করা এবং এইভাবেই একদিন অবশেষে কাজে ইস্তফা দেওয়া।

বাবার কাছে ফিরে এসে দেখি, একটা আরাম কেদারায় ডুবে শুয়ে আছেন তিনি। চোখ বোজা, শুষ্ক শীর্ণ মুখে বিনীত আত্মসমর্পণের ছবি,—ঠিক ক্যাথলিক ফাদারদের মতোই! আমাকে সাদর আহ্বান না জানিয়ে চোখ বুজেই তিনি বলছিলেন—

"তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে এইরকম ছেলের জন্যে

অহরহ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতেন। তাঁর অকালমৃত্যুর মধ্যে আজ আমি বিধাতারই ইংগিত দেখতে পাচ্ছি। অপদার্থ সন্তান!"—এবার চোখ খুললেন তিনি—"অপদার্থ সন্তান, বলো দেখি, তোমাকে নিয়ে কী করি এখন?"

আগে আমার শৈশব কৈশোরের আত্মীয় বান্ধবেরা বেশ জানতেন আমাকে নিয়ে কী করা উচিত, উপদেশ দান করতেন নানা রকম: সৈন্যদলে নাম লেখানো, ওষুধের দোকানে ঢোকা, টেলিগ্রাফ বিভাগে যোগদান···ইত্যাদি সব। কিন্তু এখন যেহেতু বিশ পেরিয়ে গেছি আমি, দাড়ি গোঁফও গজিয়েছে কিছুটা,—এবং যেহেতু আমি সৈন্যবাহিনী, ওষুধের দোকান, টেলিগ্রাফ বিভাগ প্রভৃতির কাজ ইতিমধ্যেই সমাধা ক'রে ফেলেছি—তুনিয়ার সব রকম সম্ভাবনাই এখন আমার কাছে রুদ্ধ! আমার শুভানুধ্যায়ীরাও আমাকে তাঁদের উপদেশবাণী শোনাতে বিরত হয়েছেন, আজকাল আমাকে দেখে তাঁরা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, অথবা মাথা নাড়তে থাকেন একান্ত হতাশায়।

"নিজের কথা ভেবে দেখেছো তুমি?"—বাবা ব'লে চলেন—"মানুষে তোমার এই বয়সে সমাজে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রে বসে, আর তুমি?—একটা নীচস্তরের জীব, ভিক্ষুক বিশেষ, নিজের বাবার ঘাড়ে একটা লজ্জাকর বোঝা!"

বরাবরের মতোই তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—"আজকালকার এই যুবকদল জাহান্নামে যাচ্ছে দিন দিন—তাদের অসৎ বুদ্ধি, ভ্রান্ত বস্তুবাদ আর মিথ্যা বাহাত্বরীর জন্যেই! থিয়েটারের দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত চিরদিনের জন্যে,—কারণ, ওই সবই চঞ্চল এই তরুণদলের ধর্মবোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি দিন দিন নষ্ট ক'রে ফেলছে!

"কালকে ফিরে তোমাকে নিয়ে যাব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে, প্রতিজ্ঞা করবে যে এমন কাজ আর কক্ষনো করবে না, তাঁর কথামতো চলবে।" শেষে স্থির সিদ্ধান্তের মতোই বললেন তিনি—"সমাজে নিজের একটা নির্দিষ্ট আসন ক'রে না নিয়ে একটা দিনও থাকা উচিত নয় কারও।"

"দেখুন, অনুগ্রহ ক'রে একটা কথা শুনুন",—বিস্বাদের সুরে আমিও বলছিলাম,—অবশ্যি বুঝলাম যে এই বলাবলিতে কোনোই লাভ নেই—"আপনি যাকে সমাজের পদমর্যাদা বলেন মূলে তা অর্থ ও বিদ্যার সুযোগ-সুবিধে মাত্র! ধনদৌলত নেই যাদের, বিদ্যাও নেই, নিজ হাতেই যারা খেটে খায়—আমিও তাদের থেকে আলাদা হবার কারণ দেখি না।"

"যতো সব গর্দভের মতো কথা! শারীরিক শ্রম, শারীরিক শ্রম!" —চ'টে উঠলেন বাবা—"ওরে বুঝে দেখ হতভাগা, বুঝে দেখ কুলাংগার, স্থূল এই শারীরিক শ্রম ছাড়াও তোরই মধ্যে জাগ্রত আছে পরমাত্মা,—পুণ্যশিখার এক স্ফুলিংগ। তাই তোকে বিশিষ্টভাবে আলাদা ক'রে রেখেছে সাপ ব্যাঙ্ গরু ভেড়া প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার থেকে, উন্নীত ক'রে এনেছে ঈশ্বরের কাছে! এই পুণ্য শিখাই হ'ল শ্রেষ্ঠ মানবজাতির হাজার হাজার বছরের সাধনার ফল। তোর প্রপিতামহ পলজনেভ ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি, যুদ্ধ করেছেন বরদিনোতে; পিতামহ ছিলেন কবি বক্তা, মার্শাল অব নোবিলিটি! তোর কাকা,—সেও শিক্ষক এবং এই আমি তোর বাবা একজন শিল্পী। সমস্ত পলজনেভদের হাতের এই দীপ্ত দীপমালা—সে কি জ্ব'লে রয়েছে শেষকালে তোর মতো কুলাংগারের হাতে এসে নেভার জন্যে!"

"কিন্তু মানুষের তো খাঁটি হওয়া উচিত।"—আমি বললাম—"লক্ষ লক্ষ লোক বেঁচে আছে শারীরিক শ্রমের কল্যাণে।"

"যেমন খুশি থাক না তারা। তারা জানে না জগতে অন্যকিছুও যে থাকতে পারে। যে কেউ—একটা গাধা, একটা খুনীও পরিশ্রম করতে পারে। এই শারীরিক শ্রম হ'ল দাসের ও বর্বরের ললাট-চিহ্ন! আর, পুণ্যজ্যোতি এসে ধরা দেয় বিশিষ্ট কয়েকজনের জীবনেই!"

এইভাবে আলোচনা করা একান্তই নিষ্ফল। আমার পিতৃদেব আত্মশ্রদ্ধায় অন্ধ, নিজের কথাছাড়া কিছুই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত বা গ্রহণীয় নয়। তা ছাড়া, বেশ ভালোভাবেই জানি আমি—কথায় কথায় তিনি যে কায়িক শ্রমের উপরে ঘৃণা বর্ষণ করেন তার আসল কারণ 'পুণ্যজ্যোতির' উপরে তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা নয়। আমি তাঁর একমাত্র বংশধর, আমি যে শ্রমিক হয়ে যাব এবং সমস্ত শহরময় তা নিয়ে হৈ চৈ হবে—এই গোপন আতংকেই তিনি উদ্বিগ্ন। সব চেয়ে নিদারুণ কথা: আমার সমসাময়িকেরা অনেক আগেই ভারী ভারী ডিগ্রী বাগিয়ে আরামেই আছে এখন,—ষ্টেট্ ব্যাংকের ম্যানেজারের ছেলে ইতিমধ্যেই অলংকৃত করেছে কলেক্টরীয় অর্থসচিবের পদ! আর আমি,—আমি তাঁর ছেলে, কিছুই না একটা! কাজেই, এহেন আলোচনায় লাভ নেই কোনোই। শুধু তাই নয়, এ অপ্রীতিকর। কিন্তু তখনো আমি ব'সে ব'সে ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করছি—শেষ পর্যন্ত হয়তো তিনি আমাকে বুঝবেন। সমস্ত প্রশ্ন অবশ্যি খুবই সহজ ও স্পষ্ট; আমার জীবিকার্জনের পথ হবে কোনটা? কিন্তু এর সরল সমাধানটা কারো চোখে ধরাই পড়ছিল না এবং বারবার ঘৃণার ভংগীতে আমাকে শুধু শোনানো হচ্ছিল কেমন সব ঘোরানো কথা: বরদিনো, 'পুণ্যজ্যোতি,' বিস্মৃত-কবি কোন এক পিতামহ—দুর্বল হাতে একদিন যিনি কবিতা মেলাতেন মাত্র! আমাকে ভৎর্সনা করা হ'ল কুলাংগার ও গোঁয়ারগোবিন্দ ব'লে। অথচ, কী একান্তভাবেই না আমি চাইছিলাম আমাকে বুঝুন উনি। বাবা ও

বোনকে ভালোবাসি আমি, তাদের নিয়েই আমি মতামত খাড়া করি। শিশুকাল থেকেই এটা আমার অভ্যাস। জীবনের এমন গভীরে এই অভ্যাস শিকড় মেলেছে যে আমার ভালো-মন্দ সমস্ত কাজের মধ্যে—সবসময়েই একটা শংকা জেগে থাকে, তাদের প্রাণে ব্যথা দিলাম না তো! এখনি হয়তো বাবার সারা মুখ লাল হয়ে উঠবে, হয়তো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

আমি বললাম—"বন্ধ চারটা দেয়ালের মধ্যে ব'সে নকল-লিপি রচনা করা বা একটা টাইপরাইটারের সংগে পাল্লা দেওয়ার কাজ তো আমার এই বয়সের লোকের পক্ষে লজ্জাকর, রীতিমতো অপমানকর! 'পুণ্যজ্যোতি'-র স্থান কোথায় এখানে?"

"তা, হ'লেও এটা বুদ্ধির কাজ।"—বাবা প্রতিবাদ করতে থাকেন—"কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, সংক্ষেপেই সমাধা করছি এবার। যাই হ'ক না কেন, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—তোমার আগের সেই কাজে যদি ফিরে না যাও,—যদি এই ঘৃণ্য পথই ধ'রে থাকো—তা' হলে আমিও তোমাকে মন থেকে চিরতরে দূর ক'রে দিচ্ছি, উইল থেকে মুছে ফেলছি তোমাকে,—হ্যাঁ, ভগবানের নামেই আমার এই শপথ!"

সব কাজই আমি সম্পূর্ণ সততার সংগে ক'রে থাকি এবং এখনো আমার সরল উদ্দেশ্য বোঝাবার জন্যে বললাম,—"উত্তরাধিকারের কথা আমার কাছে বিশেষ একটা কিছু ব'লে মনে হয় না; আমি আগে থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি সব!"

তখন হঠাৎ ভয়ে বিস্ময়ে দেখলাম, এই কথায় বাবা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। সারা মুখ তাঁর রক্তবর্ণ!

"কুলাংগার, আমার সামনে এতো বড়ো কথা, কী দুঃসাহস!"—

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—"শয়তান!" এবং সংগে সংগেই বহু-অভ্যস্ত ক্ষিপ্র ভংগীতে সোজা দুটো চড় বসিয়ে দিলেন আমার গালে,—"ভুলে যাচ্ছো! তুমি, কোন্ জাহান্নামে যাচ্ছো দিন দিন!"

ছোটো বেলায় বাবা যখন মারতেন, সোজা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত কোমরে হাত রেখে—সোজা মুখোমুখি। কিন্তু আজ তাঁর মার খেয়ে আমি একেবারে ঘাবড়ে গেলাম এবং সেই শৈশব-কালের মতোই সোজা হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। বাবা বৃদ্ধ শীর্ণ, কিন্তু তাঁর মাংসপেশী নিশ্চয়ই চামড়ার মতো শক্ত! কারণ, আমার গায়ে লাগছিল খুবই।

টলতে টলতে আমি ঘরের ভিতর গিয়ে পড়লাম এবং তিনিও এসে ছাতাটা দিয়ে উপর্যুপরি পিটোতে লাগলেন আমার পিঠে, ঘাড়ে ও মাথার ওপর! সোরগোল শুনে আমার বোন বৈঠকখানার দরজা খুলে দেখল, কিন্তু তক্ষণি মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল দুঃখে ভয়ে, আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে একটা কথাও বলল না।

তবে আমার সংকল্পও অচল অটল; গভর্ণমেণ্ট অফিসে ফিরব না কিছুতেই, সুরু করব নতুন শ্রমজীবন। নির্দিষ্ট কাজটা কী হবে এখন স্থির করা দরকার। তবে, তা নিয়েও বেশী বেগ পাবার কথা নয়। শরীর আমার যথেষ্টই শক্ত, কঠিনতম পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়বার কারণ নেই। সামনে আমার শ্রমজীবন—পথের পাশে পাশে ক্ষুধা, দুর্গন্ধ আর কঠিন রুক্ষতার মিছিল,—পেটের খাবারের জন্যে দিনরাত দুঃসহ সংগ্রাম। এবং শেষে একদিন হয়তো, হয়তো—কে বলতে পারে?—একদিন এই গ্রেট ম্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীট থেকে কর্মক্লান্ত হয়ে ফিরবার মুখে আমিই হয়তো ঈর্ষা করতে থাকব এঞ্জিনীয়ার

ডলঝিকভকে,—মানসিক শ্রমের দৌলতে বেশ আরামেই আছেন যিনি! কিন্তু তা' হলেও এই মুহূর্তে ভবিষ্যের সমস্ত কঠোর শ্রমের ছবি আমার মনে আনন্দের রঙে রঙিয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে আমি স্বপ্ন দেখেছি বুদ্ধিজীবী কর্মী হবার, যেমন শিক্ষক বা লেখক। কিন্তু সে স্বপ্নই হয়ে রইল। মানসলোকের আনন্দে—যেমন থিয়েটারে বা পড়াশুনায় রুচি ছিল খুবই, ঝোঁকও ছিল, তবে সামর্থ্য ছিল কি না জানিনা। স্কুলে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল গ্রীক ভাষার উপর, অর্থাৎ পড়াশুনো খতম হ'ল চতুর্থ মানেই, মাষ্টার পর্যন্ত পেছনে ছিলেন পঞ্চম মানে ঠেলে তুলবার জন্য। আর, তার পরেই তো নানা সরকারী অফিসে চাকুরী। অর্থাৎ দিনের বেশীভাগই কাটানো সম্পূর্ণ আলস্যে! আমি শুনতাম, সেই হ'ল বুদ্ধিমানের বা বিদ্বানলোকের কাজ। অফিসরাজ্যে কোনোদিনই আমার কাজে দরকার হয়নি কোনো রকম চিন্তা-সংযোজনা বা বুদ্ধিচালনা অথবা বিশেষ কোনো-রকম গুণ অথবা কোনো সংগঠনশক্তি। আগাগোড়া সবই নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো! এই ধরণের বুদ্ধির কাজের স্থান দিই আমি শারীরিক শ্রমের ঢের ঢের নীচে, আমি ঘৃণা করি এসব। আমার মনে হয়, কারও নিরুপদ্রব অলস-জীবনে এমন সব কাজের কোনো সদ্‌যুক্তি বা সদর্থই থাকতে পারে না। আসলে, এটাও সেই অলস অপদার্থতার ক্ষীণ আবরণ মাত্র। সত্যিকার মানস-শ্রমের দৃষ্টান্ত বোধহয় আমি দেখিই নি!

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা থাকতাম গ্রেট ছ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে। সারা শহরেরই প্রধান রাস্তা এটি। শহরে কোনো পার্ক বা বাগান না থাকার জন্য এই রাস্তাটিই হয়ে ওঠে সন্ধ্যায় বেড়ানোর জায়গা। সত্যি, একটি বাগানের মতোই রমণীয় এটি। দু'পাশ দিয়ে পপলার

শ্রেণীর মিষ্টি গন্ধ, বিশেষ ক'রে বর্ষার পরেই মাতাল হয়ে ওঠে চারদিক। একেসিয়াস ও লাইলাকের দীর্ঘ ঝোপ, বুনো চেরী ও আপেল গাছের সারি ঝুঁকে আছে পাঁচিলের উপর দিয়ে। বাসন্তী গোধূলির মিঠে আলো, শ্যামল বনের পাশে পাশে বাড়ন্ত ছায়া, লাইলাকের গন্ধ, মৌমাছির গুঞ্জরণ, নিঝুম নীরবতা, নরম নিশ্বাসের মতো আতপ্ত আলো—কী চমৎকার, কী প্রাণময় সব! যেন ভুলে যেতে হয় প্রত্যেক বছরের বসন্ত-সমাগমের কথা, সবই যেন আজ একেবারে নতুন! বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে পথিকদের দেখছিলাম। তাদের অনেকের সংগেই বেড়ে উঠেছিলাম একদিন, খেলেছিলাম কতো। আজ কাছে এলে তারা হয়তো ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে পড়বে; কারণ পোষাক আমার গরীবের, ফ্যাশানের চাকচিক্য নেই তা'তে। আমার ছেঁড়া ট্রাউজার ও মস্তো মোটা জুতো দেখে ঠাট্টা করে তারা! তা ছাড়া শহরেও আমার যথেষ্ট দুর্নাম; সমাজে বিশিষ্ট কোনো পদমর্যাদা নেই, প্রায়ই বিলিয়ার্ড খেলি শস্তা হোটেলখানায়, দু'-দু'বার এক পুলিশ প্রভুর কাছেও আমাকে যেতে হয়েছে,—আজ পর্যন্ত যদিও জানতে পেলাম না আমার অপরাধটা কী!

সামনেই ডলঝিকভদের বড়ো বাড়ীটায় কে যেন বাজাচ্ছে পিয়ানো। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার, আকাশে ফুটে উঠেছে মুঠো মুঠো তারা। বাবা আমার বোনের হাত ধ'রে বেড়াচ্ছিলেন, আর পথের সসম্মান অভ্যর্থনার বিনিময়ে মাথা নোয়াচ্ছিলেন বারবার। "ঐ দেখো!" আকাশের দিকে ছাতাটা তুলে তিনি বোনকে দেখাচ্ছিলেন, (ঠিক ঐ ছাতাটা দিয়েই আজ পিটিয়েছেন আমাকে!)— "দেখো ঐ অসীম আকাশ! এমন কি সবার ছোট তারাগুলিও এক একটা পৃথিবী। বিশ্ব জগতের তুলনায় মানুষ কী ক্ষুদ্র!"

এমন গলায় তিনি এই কথাগুলি বলছিলেন, তিনি যে ক্ষুদ্র—বিশেষ ক'রে এই কথাটাই যেন তাঁর কাছে কত আত্মতৃপ্তির ও গৌরবের! প্রতিভা বা কল্পনাশক্তির লেশমাত্রও নেই তাঁর মধ্যে। দুঃখের বিষয়, তিনিই হচ্ছেন আমাদের শহরের একমাত্র স্থাপত্য-শিল্পী। অথচ আমার যতদূর মনে পড়ে, পনেরো থেকে এই বিশ বছরের মধ্যে একটি মাত্র সুন্দর বাড়ীও তৈরী হয়নি এই সারা শহরটায়! কেউ তাঁকে কোনো বাড়ীর পরিকল্পনার ভার দিলে প্রথমেই আঁকবেন তিনি বৈঠকখানা। ঠিক আগের দিনের বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা যেমন নাচের ক্লাশ সুরু করত রন্ধন-নৃত্য থেকে! বাবার সমস্ত শিল্পবোধও জন্ম নিত এবং বেড়ে উঠত একমাত্র বৈঠকখানার আড্ডাতেই! সংগে তিনি জুড়ে দেন খাবার ঘর; শিশুদের ঘর, পড়ার ঘর—একটার মধ্য দিয়েই আর একটায় যাবার পথ এবং প্রতিটি ঘরেই অযথা কতগুলো দরজা। আসলে—মূল পরিকল্পনাই গোলপাকানো, গণ্ডীবদ্ধ, অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণতার উপলব্ধি থেকেই যেন বাইর বাড়ীতে ঘর তৈরী হয় একটার পর একটা। সংকীর্ণ প্রবেশ দ্বার ও বাঁকা-চোরা সিঁড়ির শেষে দাঁড়ানও যায় না! বারান্দার মেজে ইঁটের, ছাত বৃত্তাকার। ঘরের সমুখের দিকটা রুক্ষদর্শন! তার উপরকার অংকিত রেখাগুলি পর্যন্ত বিশ্রী,—সৌন্দর্যবোধের অভাবের পরিচায়ক। নীচু ছাত যেন ব'সে পড়া। মোটা মোটা চিম্‌নির উপরকার তার-নিমিত ঢাকনা টুপিগুলি ঝুলে ভর্তি। বাবার হাতে গড়া এই সব দালানই কেন যেন একই রকম, একঘেয়ে;—দেখে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে বাবাকেই—উঁচু টুপি পরা রুক্ষ কঠিন তাঁর সেই শিরোভাগটিই যেন। বাবার কল্পনার দৈন্যের সংগে ক্রমে ক্রমে পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে শহরের সবাই এবং তাই এখানে শিকড় মেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় স্থাপত্যের পদ্ধতি।

এই একই পদ্ধতি বাবা এনেছেন আমার বোনের জীবনে। ক্লিওপাত্রা নামকরণ থেকে তার সুরু (আমার নামও রেখেছেন যেমন মিজেইল !)। বোন যখন ছোটো ছিলো বাবা তাকে কথায় কথায় প্রাচীন ঋষি বা পূর্ব-পুরুষদের কথা ব'লে ব'লে হতভম্ব ক'রে দিতেন, পর্যালোচনা করতেন জীবনের স্বরূপ ও কর্তব্য বিষয়ে। আর আজও বোনের বয়স যখন ছাব্বিশ—তিনি তাকে নিয়ে চলেছেন সেই পুরানো রীতিতেই। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে, তিনি তাঁর মেয়ের হাত ধ'রে বেড়াতে দেন না, অথচ তিনিই ভাবতে থাকেন যে, আজ বা কাল বাদে উপযুক্ত কোনো তরুণ প্রেমিক নিশ্চয়ই এসে তার পাণি-প্রার্থনা করবে—এবং সেও তাঁর শিল্পগুণের উপর গভীর শ্রদ্ধাবশে ! আমার বোন ভক্তি করে বাবাকে, ভয় করে, বিশ্বাস রাখে তাঁর অতুলনীয় বুদ্ধিতে।

চারদিকে ঘন অন্ধকার, ক্রমে ক্রমে শূন্য হ'ল রাস্তা। সামনের বাড়ীর গান থেমে গেছে, দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা—তিন ঘোড়ার গাড়ীটা রাস্তা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে, ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে ঝুং ঝুং। এঞ্জিনীয়ার তার মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে চলল। শোবার সময় এখন।

বাড়ীতে আমার একটা ঘর ছিল, তবে আমি থাকি আঙিনার পাশে একটা চালাঘরে। দেয়ালে বেঁধানো মস্তো বড় একটা হুক,—বোধহয় লাগাম ঝুলোবার জন্যে। কিন্তু বছর ত্রিশেক থেকেই বাবা ওখানে খবরের কাগজ ঝুলিয়ে রাখেন। সেগুলি অর্ধবার্ষিকী ক'রে বাঁধিয়ে রেখেছেন কী জন্যে একমাত্র ভগবানই জানেন, কাউকেই তিনি ওগুলি স্পর্শ করতেও দেন না। এখানে এই ঘরটায় থাকলে বাবার সংগে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ারই কথা। একটা কথা আমার মনে হ'ল—ভালো কোঠায় যদি না থাকি এবং রোজ রোজ বাড়ীর ভিতর যদি

খেতে না যাই তা' হলেই আমি যে বাবার ঘাড়ে লজ্জাকর বোঝা এই দুর্নামের বিশেষ কোনো অর্থ থাকবে না।

বোন অপেক্ষা করছিলো আমার জন্য। বাবার অজ্ঞাতে রাতের খাবার নিয়ে এল সে। ঠাণ্ডা একটু তরকারী ও রুটি! আমাদের ঘরে কতোগুলি কথা চলিত আছে প্রবাদের মতো—"টাকাটা ভাঙালেই তা থাকে না আর।" "এক পয়সা বাঁচলো তো এক পয়সা বাড়লো" ইত্যাদি। আমার বোনও এই সব বিশ্রী নীতি হজম ক'রে ক'রে এখন পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, টানাটানিতেই চলত আমাদের। টেবিলের উপরে প্লেটটা রেখে আমার বিছানায় এসে বসল সে, আর কাঁদতে লাগল—

"মিজেইল, আমাদের সঙ্গে তোমার এমন ব্যবহার!" তার মুখ ঢাকা ছিল না, হাতের ও বুকের উপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল টপ টপ ক'রে। মুখে হতাশ ব্যথার ছাপ। বালিশের উপর উপুড় হয়ে আবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, ফোঁপানির সংগে সংগে সারা দেহ কাঁপতে লাগলো শুধু?

"আবারও চাকরী ছেড়েছ তুমি। ভগবান, হায় ভগবান! কী ভয়ানক!"

"কিন্তু শোনো, বুঝে দেখো……"কিন্তু কান্না দেখে কেমন হতাশায় ভ'রে উঠলো আমার সারা বুক।

এদিকে মুস্কিল হ'ল, লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে এল, ধোঁয়া দিতে দিতে নিভে যাচ্ছিল প্রায়। দেয়ালের হুঁকগুলির ছায়া দেখাচ্ছে মস্তো বড়ো, ছায়াগুলি নড়ছে দেয়ালে।

"হায়, ভগবান!"—বোন উঠে বসল—"ওঃ, বাবার কী দুর্দশা! আমি নিজেও রুগ্ন। মাথাই খারাপ হয়ে যাবে আমার। ও, তোমার যে

কী হবে?”—ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত দু'খানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে—“তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, ভিক্ষা চাইছি, আমাদের মায়ের স্মৃতিতে করজোড়ে বলছি—অফিসে যাও আবার!”

“সে হয় না, ক্লিওপাত্রা, সে অসম্ভব!”—তবে বুঝলাম যে আর একটু হ'লেই আমি অমনি কেঁদে ফেলব।

“কেন?”—বোন বলছিল—“কেন নয়? বড়োবাবুর সংগে যদি না বনে আর একটা কাজ নাও। রেলওয়েতেও তো চাকরী নিতে পার। অনীতা ব্লাগোভোর সংগে এইমাত্র কথা বলে এলাম। খুলেই সে বললো, রেলওয়েতে নেবে তোমাকে, এমন কি কথাও দিল তোমার জন্যে দেখবে, কাজ জুটিয়ে দেবে। ভগবানের দোহাই মিজেইল, একটু ভেবে দেখো, একটু ভাবো—আমি করজোড়ে মিনতি করছি।”

আরও কিছুকাল কথাবার্তার পরে আমিই হাল ছেড়ে দিলাম, বললাম যে রেলওয়েতে কাজ হওয়ার কথা একবারও ভাবিনি এবং তার ইচ্ছে হ'লে বেশ, কাজ নিতে রাজি আছি আমি।

চোখের জলের মাঝেই ফুটে উঠলো তার খুশির হাসি। সে আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতেই চ'লে গেল। কান্না এলে সে আর সামলাতেই পারে না। আমি এদিকে রান্নাঘরে এলাম কিছুটা কেরোসিনের খোঁজে।

(দুই)

সখের থিয়েটার, ঐক্যতানবাদন ও মূক অভিনয়ের ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী হ'ল আঝোগিনেরা: তারা থাকে গ্রেট্ দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে। থিয়েটারের ঘর তাদেরই এবং সমস্ত ব্যবস্থাপত্র বা খরচপত্রের ভারও নিজেদেরই হাতে। ধনী জমিদার তারা, মফঃস্বলে জমি আছে ন' হাজার

একর, আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। কিন্তু গ্রামের দিকে তাদের নজর নেই মোটেই, থাকে তারা বরাবরই শহরে। ঘরে মাত্র চারটি লোক। মা হ'লেন দীর্ঘাকার মার্জিত চেহারাবিশিষ্ট একটি মহিলা। খাটো ক'রে কাটা তাঁর চুল, গায়ে আঁটা জ্যাকেট, গলায় ইংরেজি ফ্যাসানের স্কার্ফ। তাঁর তিন মেয়ে। নামের বদলে ডাকা হয় তাদের বড়ো, মেজো, ছোটো। বিশ্রী তাদের চিবুকের ভংগী, উঁচু কাঁধ, চোখেও দেখে কম। তাদেরও মায়ের মতোই বেশবাস, কথা বলতে তোত্‌লায় বিশ্রীরকম। তবুও বরাবরই তারা প্রত্যেকটি অভিনয়ে অংশ নেবেই—নাটকে আবৃত্তিতে বা গানে। খুব গম্ভীর তারা, হাসেনা কখনো, এমন কি মিলন-মুখর গীতিনাট্য পর্যন্ত অভিনয় ক'রে যায় ব্যবসাদারী ভংগীতে। —একটুখানি হাসির রেখা পর্যন্ত দেখা দেয় না মুখে,—তারা যেন আফিসে ব'সে টাকার হিসেবই মেলাচ্ছে!

থিয়েটার আমার ভালো লাগে খুবই, বিশেষ ক'রে বারবার ক'রে রিহার্সেল,—খাপছাড়া, কেমন হৈ চৈ করা! এবং এই রিহার্সেলের পরেই খাবার পরিবেশন। নাটক-নির্বাচনে বা পার্ট-প্রযোজনায় হাত ছিল না আমার মোটেই। আমার কাজই ছিল রংগমঞ্চের আড়ালে। চিত্রপট আঁকতাম, পার্ট কপি করতাম. প্রম্‌প্‌ট্‌ করতাম, অভিনেতাদের সাজসজ্জা ঠিক ক'রে দিতাম, নানারকম মঞ্চচাতুর্যের বা ষ্টেজএফেক্টের ভারও ছিল আমার ওপর। যেমন, বজ্রধ্বনি, দোয়েলের শিস বা বিদ্যুৎ চমক। সমাজে আমার কোনো পদমর্যাদা ছিল না এবং আমার গায়ে দামী কোনো পোষাক না থাকায় রিহার্সেলে কোনো অংশ জুটতো না আমার, চুপ ক'রে থাকতে হ'ত সবার পিছনে, উইংসের অন্ধকারে আলাদা।

আমাকে চিত্রপট আঁকতে হ'ত আঙিনায় ব'সে। সহকর্মী ছিল

আন্দ্রে আইভানভিচ ; গৃহচিত্র সে। অবিশ্যি নিজেকে বলে সে সবরকম গৃহসজ্জার কণ্ট্রাক্টর। ছিপছিপে লম্বা মানুষ, চুপসানো গাল, চিমসে বুক, চোখের নীচে মোটা রেখায় কালি-পড়া। ভয়ানক লাগে দেখতে। মানসিক কোনো সংঘাতে ভুগছে সে ; প্রত্যেকবারেই শীতে বা বসন্তে সবাই বলত—এবার আর রক্ষে নেই লোকটার। কিন্তু দিন তিনেক বিছানায় প'ড়ে থেকে হঠাৎ সে একলাফে উঠে বসতো এবং বিস্ময়ভরে নিজেই ব'লে উঠত—"আবারও ঠেলে উঠলাম তা' হলে !"

শহরে নাম তার রাদিশ, এই নাকি তার আসল নাম। আমার মতোই থিয়েটার ভালোবাসে সে। থিয়েটার হচ্ছে শুনলে সেখানে না গিয়ে আর রক্ষে নেই। সব কাজ ফেলেই ছুট্ দেবে আঝোগিনদের ওখানে, লেগে যাবে চিত্রপট আঁকতে।

বোনের সাথে সেদিনের কথাবার্তার পরে আমি আঝোগিনের ওখানে কাজ করছিলাম,—সকাল থেকে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা সাতটায় রিহার্সেল, একঘণ্টা আগেই সব এমেচার দল বা সখের অভিনেতারা ভিড় ক'রে এসেছে। বড়ো, মেজো ও ছোটো রংগমঞ্চে পায়চারি ক'রে ক'রে হাতে-লেখা পার্ট মুখস্ত করছে।

রাদিশের গায়ে মস্তো বড়ো একটা ওভারকোট, গলায় জড়ানো স্কার্ফ, দেয়ালে মাথা হেলিয়ে সে রংগমঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে শ্রদ্ধাভরেই। মাদাম আঝোগিন এক একটি অতিথি দর্শকদের কাছে আসা যাওয়া করছেন, আলাপ করছেন মিষ্টিমুখে। কারও মুখের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস ছিলো তাঁর এবং সাথে সাথে তিনি এতো নরম ক'রে কথা বলতেন যেন গোপন কিছুই বলছেন। আমার কাছে এসে তিনি চুপি চুপি বললেন, "চিত্রপট আঁকা নিশ্চয়ই খুব শক্ত কাজ। তোমাকে ভিতরে আসতে দেখে এইমাত্রই আমি কুসংস্কারের কথা

বলছিলাম—মাদাম মুকফের কাছে। আ ভগবান, সারা জীবনটাই আমি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ল'ড়ে এলাম। চাকরদের আমি বেশ ক'রে বোঝাতে চাই তাদের ভয়টয় সব বাজে। তাই তিনটে মোমবাতি জ্বেলে রাখি ; আর, আমি নিজেও সমস্ত কাজই সুরু করি মাসের ঠিক তেরো তারিখে !”

ডলঝিকভের মেয়ে এলো,—গোলগাল সুন্দরী মেয়ে। সবাই বলে তার পা থেকে মাথার পোষাক পর্যন্ত সবই নাকি প্যারীর আমদানী। কখনো অভিনয় করত না সে, কিন্তু সবসময়েই রিহার্সেলের সামনে একটা চেয়ার পাতা থাকত তার জন্যে ! সবার চোখ ঝলসে দিয়ে ঝলমলে পোষাকে তার আগমনের আগে কোনো অভিনয়ই আরম্ভ হ'তে পারত না ! অর্থের খাতিরে সে রিহার্সেলের মধ্যেই যা খুশী মন্তব্য পেশ করতে পারত এবং এসবই করত সে আবদারে একটু হাসির সংগে। মানে, সোজাই বোঝা যেত, সব কিছুই সে মনে করছে ছেলেখেলা,—একরকমের মজা ! পিটার্সবার্গের কন্‌সার্ভেটরিতে সে নাকি সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করত এবং একটা প্রাইভেট থিয়েটারে সমস্ত শীতকালটাই সে নাকি গান গেয়েছে শুনছিলাম। আমার চোখে তাকে ভারী সুন্দর লাগছিল এবং সাধারণত রিহার্সেলের সময় আমি শুধু তাকেই দেখতাম, এমন কি চোখ ফিরিয়ে আনতেও ভুলে যেতাম।

হাতে লেখা নাটকটা তুলে সবেমাত্র প্রম্‌প্‌ট্‌ করতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার বোন এসে উপস্থিত। পোষাক বা টুপি না ছেড়েই সে আমার কাছে এসে বলল,—“আমার সংগে এস, অনুরোধ করছি তোমায়।”

তার সঙ্গে এলাম। রংগমঞ্চের পেছন দরজায় অনীতা ব্লাগোভোও দাঁড়িয়ে,—মাথায় টুপি, গায়ে কালো একটা ওড়না।

কোর্টের সহকারী সভাপতির মেয়ে সে;—ভদ্রলোক বোধহয় কোর্টের জন্ম থেকেই নির্বিবাদে অলংকৃত ক'রে আছেন ঐ অনড় আসন! মেয়েটি তন্বী সুন্দরী,—মূক অভিনয়ে তার অংশ ছিল একান্তই প্রয়োজনীয়। সে যখন পরী বা যশের রাণী হয়ে দাঁড়াত, একটা লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠত তার মুখখানি। কিন্তু নাট্য-অভিনয়ের মধ্যে কোনো অংশই নিত না সে, রিহার্সেলেও আসত বিশেষ কোনো কাজেই শুধু, হলের ভেতরে ঢুকত না। আজও সে ভেতরে উঁকি মেরে দেখল শুধু।

"আমার বাবা আপনার কথা বলছিলেন।"—চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ রেখে লজ্জায় বাধো বাধো গলায় বলল সে—"এঞ্জিনিয়ার ডলঝিকভ্ আপনাকে রেলওয়েতে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। আবেদন করুন, বাড়ীতেই থাকবেন তিনি।"

এই কষ্ট স্বীকারের জন্যে মাথা নুইয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

"এবারে আপনি এটা ছেড়ে দিতে পারেন!"—আমার হাতের খাতাটা দেখাল সে।

আমার বোন ও অনীতা মাদাম আঝোগিনের সংগে দু' মিনিটকাল কী যেন আলোচনা করল আমার দিকে তাকিয়ে,—আমার কথাই বলছে বোধহয়।

"হ্যাঁ ঠিকই তো?"—মাদাম আঝোগিন আলগোছে আমার কাছে এসে মুখের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে থেকে বললেন—"সত্যিই যদি আর কোনো ভালোকাজ হাতছাড়া হয়তো"—এই ব'লেই তিনি খাতাটা হাত থেকে নিলেন—"হ্যাঁ, তা' হলে আর কাউকে এ কাজের ভার দিয়ে দেব'খন। তুমি ভেব না, হ্যাঁ বুঝলে, বাড়ী ফিরে যাও; শুভ কামনা জানাচ্ছি আমি।"

আমিও বিদায় নিলাম ; বাড়ী ফিরে এলাম একটু বিব্রত অবস্থাতেই ! সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম আমার বোন ও অনীতা কী যেন বলাবলি করতে করতে চ'লে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। সম্ভবত, আমার রেলওয়েতে চাকরীর কথা। আমার বোন কোনোদিনও রিহার্সেলের ওখানে পা বাড়ায়নি, তাই বোধহয় সে মনে মনে পীড়া বোধ করছিল—বাবা যদি জানতে পান যে তাঁর অনুমতি না নিয়েই সে আঝোগিনদের ওখানে গিয়েছে—তাই তার ভয় করছিল।

পরদিন বারোটা থেকে একটার মধ্যে গেলাম ডলঝিকভদের বাড়ী। চাকরটা আমাকে নিয়ে এল চমৎকার একটি ঘরে। এটা এঞ্জিনীয়ারের বৈঠকখানা এবং তাঁর পড়ার ঘর। এখানকার পরিবেশ কেমন মোলায়েম, কেমন বিশিষ্ট মর্যাদাময়। আমার মতো বিলাসে অনভ্যস্ত লোকের কাছে সমস্তই ঠেকছিল বিচিত্র। দামী দামী কম্বল, বড় বড় আরাম কেদারা, ব্রঞ্জমূর্তি, সোনার ফ্রেম, দেয়ালে দেয়ালে ছবি—কেমন ফিট-ফাট, সহজসুন্দর,—চারদিকেই কেমন ঢলো ঢলো লাবণ্য। বৈঠকখানার সংগেই একটা বারান্দা, তার পরেই বাগান। লাইলাকের গুচ্ছ চারদিকে, মাঝখানে পাতা খাবার টেবিল, তার উপরে ফুলের মস্ত বড় একটা তোড়া ও দামী সুরার বোতল। সর্বত্রই বসন্তের সুবাস, আর সিগ্রেট গন্ধের আমেজ। চারদিক থেকে সবাই যেন ব'লে উঠছে—"এই, এই একটি লোক—বহু শ্রমের ফলে যিনি লাভ করেছেন দুনিয়ার সমস্ত সুখ !" এঞ্জিনীয়ারের মেয়ে পড়ার টেবিলে ব'সে একটা পত্রিকা পড়ছিল।

"ও, আপনি বাবার সংগে দেখা করতে এসেছেন ?"—জিজ্ঞেস করলো সে। "ধারাজলে চান কচ্ছেন তিনি, এক্ষুণি আসবেন। আপনি বসুন একটু।"

আমি বসলাম।

"আপনি বোধহয়, সামনের বাড়ীতেই থাকেন।"—কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ!"

"আমার এত খারাপ লাগে যে রোজই আমি জানলার দিকে চেয়ে থাকি, রোজই দেখতে পাই আপনাকে। ক্ষমা করবেন।"—সংবাদপত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বলছিল সে—"আপনার বোনকেও দেখি,—এমন নম্র, এমন শান্ত মেয়ে!"

তোয়ালে দিয়ে ঘাড় রগড়াতে রগড়াতে ডলঝিকভ এসে ঢুকলেন। "বাবা, এই মঁশিয়ে পলজনেভ্"—মেয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ব্লাগোভা বলছিল বটে,"—আমার দিকে তিনি হাতখানা একবার বাড়িয়েও দিলেন না! "কিন্তু শোনো, কী আমি দিতে পারি তোমাকে? কোন ধরণের চাকরী আছে আমার হাতে? সত্যি, অদ্ভুত লোক সব তোমরা।" এবারে আরো উচ্চকণ্ঠেই আরম্ভ করলেন তিনি, আমাকে যেন বক্তৃতা শোনাচ্ছেন—"তোমরা কুড়িখানেক করে রোজ আসবে আমার কাছে; ভাবো, আমিই বড়কর্তা, কিন্তু বন্ধুগণ, আমি তৈরী করছি রেললাইন। আমার হাতে কুলিমজুরের কঠিন কাজঃ মিস্ত্রী, মেকানিক, কামার, ছুতোর কূপখনক এই সব,—কিন্তু তোমরা পারো শুধু ব'সে ব'সে কলম পিষতে, যত্তো সব কেরাণীর দল!"

মনে হ'ল, ঠিক তাঁর আরাম কেদারাটার মতোই তাঁর মুখের ভাবটা। বেশ শক্তিমান তিনি। চওড়া বুক, গায়ে তুলোর গরম সার্ট, পরণে ট্রাউজার, ঠিক যেন একটা চীনে-মাটীর গাড়োয়ান। কুঞ্চিত বৃত্তাকার দাড়ি ঝুলে আছে তাঁর চিবুকের নিচে, একগাছি চুলেও রঙ্ ধরেনি, নাকটা বাঁকা, নির্মল চোখ দু'টী স্পষ্ট উজ্জ্বল।

"কি করতে পারো ?" নিজেই বলতে লাগলেন,—"কিছুই পারো না ! দেখো, আমি হ্লাম এঞ্জিনীয়ার। এঞ্জিনীয়ার লোক আমি, কিন্তু রেল-লাইনের কাজের আগে দস্তর মতো গায়ে খাটতে হয়েছে আমাকে, স্রেফ মজুর-মিস্ত্রীই ছিলাম আমি। বেলজিয়ামে দু'বছর কাজ করেছি অয়েলার হ'য়ে। বুঝলে তো, কাজেই কী ধরণের কাজ দিতে পারি তোমাকে ?"

"তা ঠিকই......" একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়লাম, তার তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না পর্যন্ত।

"যা হোক, টেলিগ্রাফের কাজ করতে পারো ?"—একটু থেমে কী ভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ কেরাণী হিসেবেও কাজ করেছি।"

"হুঁ—আচ্ছা তা হলে দেখা যাবে। তার আগে দ্যুবেত্‌স্কিয়ায় যাও। সেখানে আমার একজন লোক আছে ; অবিশ্যি সে একটা আচ্ছা হতভাগা !"

"তা, আমার কাজ হবে কি ধরণের ?"

"সে দেখা যাবে, আগে যাও তো সেখানে, ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলবো। হ্যাঁ, শুধু মদ গিলবেনা, আর এটা সেটা অনুরোধ নিয়ে বিরক্ত করবে না—তা' হলে কিন্তু তাড়িয়ে দেবো সোজা।"

তিনি ফিরে চললেন, এমন কি আমার দিকে মাথাটা একবার হেলালেন না পর্যন্ত।

তাঁর ও তাঁর মেয়ের দিকে মাথা নুইয়ে চ'লে এলাম আমি। মেয়েটি তখনো নিজমনে পত্রিকা পড়ছিল। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল ! আমার বোন যখন জিজ্ঞেস করলো, এঞ্জিনীয়ার কি রকম ব্যবহার করেছে আমার সংগে, একটা কথাও মুখ ফুটে বেরুল

খুব ভোরে উঠলাম, সূর্য ওঠার সাথে সাথেই ত্যবেত্‌স্কিয়ায় যাবো। আমাদের গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই,—ঘুমিয়ে আছে সবাই। এই নিরালা নির্জনে শুধু বারবার বেজে উঠছে আমার পায়ের হালকা শব্দ। শিশিরভেজা পপলার গাছ আকাশ বাতাস ভ'রে তুলেছে মিষ্টিগন্ধে, অজানা ব্যথায় মনটা ভ'রে এল, এই শহর ছেড়ে······যেতে ইচ্ছে হয়না কোথাও। আমার এই শহরকে কতো ভালবাসি আমি। এত বিশ্রী অথচ এত সুন্দর! চারদিকে কচি সবুজের সমারোহ, নিস্তব্ধ উজ্জ্বল প্রভাত, গির্জার মধুর ঘণ্টাধ্বনি,—কী সুন্দর! কিন্তু এই শহরের লোকেরা কী রকম একঘেয়ে, এমন কি বিশ্রী বিরক্তিকর। আমার কাছে তারা যেন বিদেশীর মতোই!

আমি বুঝে উঠতে পারিনা—এই পয়ষট্টি হাজার লোক বেঁচে আছে কেন, কী নিয়ে বেঁচে আছে এবং কী জন্যই বা? কিম্‌রি সহর বেঁচে আছে বুটজুতোয়, তুলা-ষ্টোভ ও বন্দুকে; ওডেশা বিখ্যাত বন্দর এবং আমাদের দুটো প্রধান ষ্ট্রীট জীবন ধারণ করছে মূলধন ও পাবলিক ট্রেজারীর চাকরীর কল্যাণে। কিন্তু আর আটটা রাস্তা,—যেগুলি পাশাপাশি গিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরান্তের পাহাড়ের ওপারে—সে গুলির জীবিকাপথ আমার কাছে চিরদিনই একটা নিরুত্তর ধাঁধাঁ! আর, কী ভাবে যে এই এতগুলি লোক বাস করে তা বর্ণনা করতেও লজ্জা হয়। নেই বাগান, নেই কোনো থিয়েটার, নেই কোনো ব্যাণ্ডপার্টি,—পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্লাব লাইব্রেরীতে আসে কেবল ইহুদী যুবকেরা;—অর্থাৎ পত্রিকা ও নতুন বইগুলি চিরদিনই প'ড়ে থাকে আলমারীতে! উচ্চশিক্ষিত ধনী লোকেরা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয় তাদের সংকীর্ণ ঘরে—ছারপোকাভর্তি দামী পালংকে। তাদের ছেলেপিলেদের রাখা হয় বিশ্রী নোংরা ঘরে,—সেগুলিই নাকি নার্সারি! শিশুমঙ্গল-গৃহ!

এবং চাকরেরা, এমন কি ভালো চাকরেরা পর্যন্ত রান্নাঘরের মেজেতে ঘুমোয় ছেঁড়া নোংরা কম্বলে। বাড়ীগুলির দৈনন্দিন ছবি হ'ল : ঘর থেকে আসছে বাঁধাকপির ঝোলের গন্ধ আর মাছখাওয়ার দিনে তেলেভাজা ষ্টার্জন মাছের মিষ্টি ঝাঁঝ! খাবার ভালো নয়, পানীয় জলও দূষিত। শহর-পরিষদে, সরকারী মহলে, প্রধান বিশপের ওখানে এবং চারদিকের প্রত্যেক বাড়ীতেই ফি-বছর সবাই ব'লে আসছে,—শহরে জল-সরবরাহের কোনো সুলভ ব্যবস্থা নেই, কাজেই এই উদ্দেশ্যে টেজারী থেকে দু'লক্ষ রুবল ঋণ দেওয়া দরকার। কিন্তু ক্রোড়পতিরা (শহরে সংখ্যায় যাঁরা তিন ডজনের কম নন!) এবং বড় বড় জমিদারেরা—জুয়ো খেলাতেও যাঁরা জমিদারী শুদ্ধু নীলামে চড়িয়ে দেন—তাঁরাও খেয়ে আসছেন সেই পচাজল এবং বংশপরম্পরায় জল-ব্যবস্থার জন্য ঋণের কথাটাই সোৎসাহে আলোচনা ক'রে আসছেন শুধু। সত্যিই আমি এসব বুঝে উঠতে পারি না! সেই দু'লক্ষ রুবল যদি তাঁদের ভারী ভারী পকেট থেকে নিজেরাই সে উদ্দেশ্যে তুলে দেন, তাহ'লে কিন্তু সবই সহজে শেষ হয়।

সারা শহরে একটা খাঁটি লোকও চোখে পড়লো না আমার। আমার পিতৃদেব ঘুষ নেন এবং ভাবেন, সেটা হচ্ছে তাঁর প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি। হাই স্কুলেও তাড়াতাড়ি এক ক্লাশ থেকে উপর ক্লাশে উঠবার জন্য ছেলেরা ঘোরে মাষ্টারদের পিছু পিছু এবং মাষ্টাররাও সুযোগ বুঝে টাকা মারে ডাকাতের মতো! নতুন সৈন্যদের ভর্তি হবার সময় সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী তাদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়, এমন কি খাবার জন্যে কুলটা কুমড়োটা নিতেও কসুর করে না। একবার তো মাগনা মদ খেয়ে তার প্রাণই যায় আর কি, গির্জা থেকে উঠতেই পারে না আর! ডাক্তার ঘুষ নেয় প্রচুর—পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেই!

সদর ডাক্তার ও পশুচিকিৎসক গো-খানা ও রেস্তোঁরার উপরে মোটা ট্যাক্স ধার্য ক'রে তা দিয়ে ভর্তি করে নিজেদেরই পকেট! জিলা-স্কুলের সবাই তো সার্টিফিকেটের ব্যবসাই ফেঁদে বসেছে,—সামরিক চাকরী থেকে সাময়িক ছুটি মঞ্জুর করাতে পারলেই কাঁচা টাকা। গির্জা-প্রধানও ঘুষ খান পুরুতদের কাছ থেকে,—বিশপদের কাছ থেকে পর্যন্ত। পৌরসভা বা মিউনিসিপাল বোর্ড, শিল্পসমবায় ও অন্যান্য সমিতিতে গেলে সর্বত্রই ঐ এক কথা: আগে সেলামি! আবেদনকারীও ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিক দিয়ে টুপ ক'রে ফেলে দেয় সিকিটা আধুলিটা। আর যাঁরা ঘুষখোর নন,—যেমন বিচারবিভাগের উচ্চতন পদস্থরা—তাঁরা উদ্ধত ও অভদ্র, করমর্দনের বেলায় বাড়িয়ে দেন শুধু বুড়ো আঙুলটা! তাঁদের বৈশিষ্ট্যই হ'ল নির্মমতা ও বিচারের সংকীর্ণতা, প্রায় সময়েই তাঁরা ডুবে থাকেন মদে আর জুয়োখেলায়, মশ্‌গুল থাকেন প্রেয়সী ও রক্ষিতাদের নিয়ে! একটা বিষাক্ত আবহাওয়া তাঁরা ছড়িয়ে রাখেন সমাজের পারিপার্শ্বিকতায়! কেবল কিশোরী ও তরুণীদের বুকেই ফুটে আছে পবিত্র প্রাণের সুরভি, অনেকের জীবনেই আছে উচ্চাশা, উচ্চবৃত্তি; নির্মল সরল তাদের মন। কিন্তু তারাও বোঝে না জীবনের মর্ম, বিশ্বাস করে যে ঘুষ দেওয়া হয় গুণের পূজারূপেই, এবং বিয়ের পরে দুদিন যেতে না যেতেই তারা বুড়িয়ে যায়,—তলিয়ে যায় হীন জঘন্য স্থূল বিলাসের মধ্যে।

তিন

শহরের পাশেই তৈরী হচ্ছে রেল লাইন। উৎসব-ভোজের কিছু আগে থেকেই পথে পথে ভিখিরীর ভীড়: শহরের সবাই বলে তাদের 'কাঙালের দল'; তাদের ভয়ও করে খুব। অনেকবারই দেখেছি আমি,

—এদের একজনকে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশষ্টেশনে এবং তারই সাক্ষ্যস্বরূপ পিছু পিছু যাচ্ছে রক্তাক্ত কাপড়চোপড়, একটা ষ্টোভ বা অন্য কিছু। এই ভিখিরীরা সাধারণত আড্ডা দেয় সরাই-খানায় বা বাজারের আশেপাশে। মদ খেয়ে যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয় তারা, পথে হাল্‌কা-ধরণের মেয়ে দেখলেই জোরে জোরে শিষ দিয়ে পিছু নেয়। এই বুভুক্ষু মিছিলকে মজা দেখাবার জন্যে আমাদের দোকানদারেরা কুকুর বেড়ালকে ভোদ্‌কা খাইয়ে দিত অথবা কেরোসিনের মশাল বেঁধে রাখতো কুকুরের লেজে! সোরগোল উঠতো অমনি, রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলে কুকুর, ঝং ঝং করতে থাকে লেজে-বাঁধা টিনের বাক্স,—আর কুকুরটা ভাবে তার পিছনে বুঝি তাড়া ক'রে আসছে একটা জানোয়ার! ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেটা চ'লে যায় শহরের বাইরে গাঁয়ে, তারপর প'ড়ে গিয়ে ম'রে যায়। শহরের কতকগুলো কুকুর তো ভয়েই কাঁপতে কাঁপতে চলে, লেজটা সব সময় গুটিয়ে রাখে দু' পায়ের মাঝে। সবাই বলে—অমন সাংঘাতিক আমোদ হজম করতে পারেনি ওরা, পাগল হয়ে গেছে!

শহর থেকে চার মাইল দূরে তৈরী হবে একটা ষ্টেশন। এঞ্জিনীয়াররা ঘুষ চেয়েছিল পঞ্চাশ হাজার রুবল, তা হ'লেই রেললাইনটা তারা শহর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে; কিন্তু সহর-পরিষদ দিতে রাজী মাত্র চল্লিশ হাজার। দু'পক্ষ একমত হতে পারলো না; এখন অবশ্যি শহরবাসীর আফশোষ করছে, কারণ ষ্টেশন পর্যন্তই এখন নতুন রাস্তা করতে হবে,—তার খরচ পড়বে আরো বেশি। সমস্ত রেইল-লাইনে রেইল ও স্লীপার বসানো হয়েছে, ট্রেণ যাতায়াত করছে প্রচুর মালমশলা ও মজুরদল নিয়ে। ডলাঝিকভের পুলটা শেষ হচ্ছেনা ব'লেই যা দেরী,—কয়েকটা ষ্টেশনও শেষ হয়নি এখনও।

প্রথম ষ্টেশনের নাম হ্যবেত্‌স্নিয়া—শহর থেকে বারো মাইল। হেঁটে চললাম সেখানে। ভোরের আলোয় নেয়ে-ওঠা শস্যক্ষেতগুলি কেমন চিকণ সবুজ। ঐ উন্মুক্ত অবাধ বিস্তৃতি কী যে সুন্দর! স্বাধীনতার আনন্দের জন্য প্রাণটা কী রকম যে অধীর হ'য়ে ওঠে! শুধু যদি একটি সকালের জন্যও শহরের আওতা থেকে মুক্তি পেতাম, আর চিন্তাভাবনা থাকতো না কোনো অভাবের, পেটে জ্বলতো না বিষম ক্ষুধা। সদাসর্বদাই সচেতন ক্ষুধার একটা তীব্র অনুভূতি আমার জীবনকে ক্ষইয়ে এনেছে,—আমার শ্রেষ্ঠ সুন্দর চিন্তার সংগে অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে মাছভাজা, আলুর ঝোল ও মাংসের লোভনীয় গন্ধ! এখানে এই প্রাণখোলা মাঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছি আকাশের দিকে: একটা চড়ুই উড়ে চলেছে উপর থেকে আরো উপরে, গান গাইছে পাগোল খুশিতে। আর, তখনো ভাবছি আমি,—'এক টুকরো রুটি আর মাখন পেতাম যদি!' অথবা পথের পাশে ব'সে ব'সে চোখ বুজে শুনছি বসন্তের মধুর মর্মর ধ্বনি—কিন্তু বারবার ক'রেই শুধু ভেসে আসে গরম গরম আলুর লোভনীয় গন্ধ! দেহ আমার দীর্ঘ, গঠনও বেশ শক্ত, কিন্তু কম খেতে হয় ব'লে আমার মধ্যে রাত্রিদিনের উদগ্র চেতনা হ'ল ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ক্ষুধা। এবং সম্ভবত, এইজন্যই এত ভালোভাবে বুঝি আমি,—"এই যে অগণিত জনসাধারণ মাথার ঘাম যারা পায়ে ফেলে খাটছে, কেন এরা পেটের কথা ছাড়া আর কোনো কথাই ভাবতে পারে না।"

হ্যবেত্‌স্নিয়াতে ষ্টেশনের ভেতরটা আর পাম্পিংষ্টেশনের ঘরটার উপরকার তলাটা চুনকাম হচ্ছিল। ভয়ানক গরম পড়ছে, চুনের ঝাঁঝালো গন্ধের মধ্যে মজুরেরা অনবরত কাজ ক'রে যাচ্ছে,—চারদিকে কত যন্ত্রপাতি ও চুনবালির স্তূপ। পোষ্টবক্সে ব'সে

ঝিমোচ্ছে পয়েন্টস্‌ম্যান, মুখের উপরই পড়েছে কড়া রোদ। আশে-পাশে গাছ নেই কোনো। ক্ষীণ শব্দ উঠছে টেলিগ্রাফের তারে, এখানে ওখানে তার উপর ব'সে আছে দু'একটা বাজ। আমিও আবর্জনা স্তূপের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরছি—কি যে করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে শুধু এঞ্জিনীয়ারের কথাটা। কি রকম কাজ হবে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন—তা দেখা যাবে। কিন্তু এই বন্ধ্যা প্রান্তরে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রাজমিস্ত্রীরা বলছিল ফোরম্যান ও ফিয়ডত্ ব'লে আর একজনের কথা;—আমি কিছুই না বুঝে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। সর্বাঙ্গে একটা ক্লান্তি, হাতে পায়ে ও পিঠে যেন কতগুলি দুর্বিসহ বোঝার ভার, তা নিয়ে যে কী করা যায় ঠাহর করা যায় না।

ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পরে চোখে পড়লো টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলি ষ্টেশন থেকে ডান দিকে চ'লে গেছে সোজা,—এবং এসে থেমেছে মাইল দেড়েক দূরে একটা সাদা বাড়ীর পেছনে। মজুরেরা বলেছে ওখানেই অফিস;—তাহ'লে ওখানেই যেতে হবে আমাকে।

মস্ত বড় একটা জমিদারী কাছারী ঘর, পোড়ো বহুদিনের। চারপাশে পাঁচিল, ধ্ব'সে গেছে অনেক জায়গা, ঘরটার ভাঙা দেয়ালগুলির মুখোমুখি ফাঁকা মাঠ। ছাতটার অনেক জায়গা ক্ষয়ে গেছে, বেরিয়ে রয়েছে টিন। গেট দিয়ে ভিতরে এলে মস্ত বড় আঙিনা, আগাছায় ভরা। পুরানো ও পোড়ো কাছারী বাড়ী, মরচে প'ড়ে লাল হয়ে আছে ছাতটা। জানালায় সার্সি বা রোদবন্ধ। ঠিক একই রকম দুটো ঘর বাঁ পাশে, একটার জানালা তক্তা দিয়ে বন্ধ আর একটার খোলা। কাছেই চরছে বাছুর। শেষ টেলিগ্রাফ পোষ্টটি এইখানে এই আঙিনায়ই। তারগুলি চ'লে গেছে ফাঁকা মাঠের মুখোমুখি ঘরটার মধ্যে। দরজাটা খোলা। ভেতরে এলাম আমি।

টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি নিয়ে টেবিলের পাশে ব'সে আছে এক ভদ্রলোক, মাথাভরা কোঁকড়ানো চুল, গায়ে কোট। ভুরু কুঁচকে সে ব'লে উঠলো—

"কি হে নাই-মামার-চেয়ে-কানা-মামা!"

এই হ'ল আইভান শেপ্রাকভ্, স্কুল-জীবনের সহপাঠী; দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তাড়া খেয়েছিল সে ধূমপানের অপরাধে। আমরা দু'জনে মিলে ধরতাম প্রজাপতি, ফড়িং আর রং-বেরঙের কাচপোকা এবং খুব ভোরে ভোরে উঠে বিক্রী ক'রে আসতাম বাজারে। বাবা মা জানতেও পেতেন না, তখনো তাঁরা ঘুমিয়ে। ষ্টার্লিং পাখী মারতাম বাঁশের বন্দুক দিয়ে, কুড়িয়ে জড়ো করতাম আহত পাখীদের, কতকগুলি যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে ম'রে যেত মুঠোর মধ্যেই। এখনো মনে পড়ে, রাতের বেলায় কি রকম পাখা ঝাপটাতো তারা; যেগুলি বাঁচতো বিক্রী ক'রে ফেলতাম। ক্রেতাদের কাছে বুক ফুলিয়ে শপথ করতাম সবগুলিই মোরগ—খাঁটি মোরগ। একবার একটি মাত্র ষ্টার্লিং বিক্রী বাকী ছিল, সবাইকে কিনতে ডাকছিলাম বারবার, শেষ পর্যন্ত বিক্রী ক'রে দিলাম আধ পয়সাতেই। "যা হোক, নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো!"—আধলাটা পকেটে রাখতে রাখতে নিজেকেই বোঝাচ্ছিলাম এবং সেই থেকেই রাস্তার লোকেরা ও স্কুলের ছোঁড়ারা আমার পিছু পিছু ডাক ছাড়ে—"ঐ যায় নাই-মামার-চেয়ে-কানামামা"। আজও রাস্তার লোকেরা আর দোকানদারেরা ঐ নামে টিটকারী দেয় আমাকে,—যদিও জানে না তারা নামের ইতিহাসটা।

খুব মজবুত লোক নয় এই শেপ্রাকভ্। তার বুকখানা চুপসানো, পা দু'টো লম্বা লম্বা। গলা-বন্ধের বদলে পরে সে সিল্কের ফিতে; কোটের বালাই নেই, বুটের যা অবস্থা তাতে আমার উপরেও টেক্কা

মেরেছে, গোড়ালিটা এক পাশে বেঁকে গিয়ে ভেংচি কাটছে। তাকায় সে চোখ গোল গোল ক'রে, শক্ত হয়ে থাকে সমস্ত দেহ—ঠিক এক্ষুণি যেন এক লাফে গিয়ে ধরবে কিছু একটা। তার ভাবটা এমন যে, সব সময়েই যেন একটা মহা অসুবিধের মধ্যে আছে সে। "দাঁড়াও একটু", ব্যস্তসমস্তভাবেই বললো সে, "শোনো, কি যেন বলছিলাম ?"

আলোচনা সুরু হ'ল আমাদের। জানতে পেলাম, এই এষ্টেটটা কিছুদিন আগেও ছিল শেপ্রাকভের সম্পত্তি,—এই গত শরতেই মাত্র ডলঝিকভের অধীনে এসেছে। নোটের কাগজের বদলে তিনি টাকা খাটান সম্পত্তিতে এবং ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছেন তিন তিনটে মরগেজী সম্পত্তি। বিক্রী করার সময় শেপ্রাকভের মা নিজের জন্যও এক ব্যবস্থা করেছিলেন : ছ'বছর পর্যন্ত তাঁর অধিকারে থাকবে পাশের বাড়ীটা এবং তাঁর ছেলেকেও চাকরী দিতে হবে।

"হয়তো এটাও কিনে ফেলবে,"—শেপ্রাকভ্ এঞ্জিনীয়ারের কথাই বলছিল,—"ঠিক বলছি আমি, দেখে নিও, এক কণ্ট্রাক্টরের উপর দিয়েই সে মেরে নেয় কত ; সবাইকেই চুষে খায় সে।"

তারপর, সে আমাকে খেতে নিয়ে চললো ; ব্যস্তসমস্তভাবেই বলছিল আমার সব ব্যবস্থার কথা : তাদের সংগে থাকবো, খাবার যোগাবেন তার মা। "একটু হাত ভারী হ'লেও মা তোমার কাছে বেশি কিছু দাবী দাওয়া করবেন না",—সে বললো।

ছোট ছোট ঘরগুলি খুবই আঁটসাঁট, এখানে তার মা থাকেন। সব ঘরগুলিই—এমন কি পথ ও বারান্দা পর্যন্ত নানা জিনিসপত্রে ঠাসা। জিনিসগুলি নীলাম বিক্রীর পরে বড় ঘর থেকে আনা হয়েছে। সবগুলিই মেহেগনি কাঠের। মাদাম শেপ্রাকভ্ শক্তপোক্ত মাঝ বয়সী মহিলা। বাঁকা চীনা চোখ তাঁর। জানালার কাছে বড়

একটা আরাম কেদারায় ব'সে তিনি মোজা বুনছিলেন। আমাকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।

"মা, এই পলজনেভ্!"—শেপ্রাকভ্ পরিচয় ক'রে দিল, "এখানেই চাকরী করবে।"

"উঁচু বংশের লোক তো তুমি?"—অদ্ভুত এক অপ্রীতিকর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন মাদাম শেপ্রাকভ্। শুনে মনে হচ্ছিল তার গলার মধ্যে একটা কিছু যেন আটকে গেছে।

"হ্যাঁ"!—উত্তর দিলাম।

"বসো।"

খাওয়া হ'ল কোনো রকমে। তেতো দই দিয়ে পিঠে এবং ঝোল। মাদাম শেপ্রাকভ্ই পরিবেশন করছিলেন। প্রথমে তিনি অদ্ভুতভাবে পিট্‌পিট্ করছিলেন এক চোখ, তারপর আর এক চোখ। কথা বলতে বলতে খাচ্ছিলেন তিনি; তাঁর সমস্ত দেহেই জড়িয়ে আছে ভয়ংকর কি যেন! মনে হয় শবেরই গন্ধ বুঝি! সে যেন কোনো অতীত জীবনের অস্পষ্ট একটু ঝলক: একদিন তিনিও ছিলেন সম্ভ্রান্ত মহিলা, ছিল অনেক প্রজা, স্বামী ছিলেন তাঁর সেনাধ্যক্ষ,—চাকরেরা সম্বোধন করতো যাঁকে "ইওর এক্সেলেন্সি"!—এই সব চেতনার ক্ষীণ একটু ছায়ামাত্র আজ লুকিয়ে আছে তাঁর মধ্যে। এই ক্ষীণ ছায়াটুকু সঞ্জীবিত হয়ে উঠতেই তিনি তাঁর ছেলেকে মাঝে মাঝে ব'লে উঠতেন, —"জিন, ঠিকভাবে ধরো ছুরিটা।"

অথবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতিথিদের কাছে ভদ্রভঙ্গীতে বলতেন:

"জানেন, আমাদের এষ্টেটটা বিক্রী হয়ে গেছে। খুবই অবাঞ্ছি

দুঃখের কথা, এতদিনের জায়গাটা! কিন্তু জিনকে তো দ্যুবেত্‌স্নিয়ার ষ্টেশনমাষ্টার ক'রে দিয়েছে। কাজেই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি না আমরা। ষ্টেশনেই থাকবো, আসলে আমার নিজের জায়গায়ই থাকার মতো হ'ল। এঞ্জিনীয়ারটি বেশ লোক, খুব ভাল লোক, না?"

কিছুদিন আগেও শেপ্রাকভেরা থেকেছে খুব জাঁকজমকে, কিন্তু জেনারেলের মৃত্যুর পর হাল ফিরেছে সব কিছুরই। মাদাম শেপ্রাকভ্‌ ঝগড়া বাধিয়ে নিলেন প্রতিবেশীদের সংগে, গেলেন আদালতে, ফিকির জোটালেন কর্মচারী ও মজুরদের ফাঁকি দেবার। কেবল চুরি, রাহাজানি,—ফলে দশ বছরের মধ্যে দ্যুবেত্‌স্নিয়ার চেহারা আর চিনবার জো রইল না।

মস্ত বড় বাড়ীটার পেছনে পুরোনো বাগানটা বন হ'য়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই, ভ'রে গেছে জংগলে। বারান্দাটা আছে এখনো অটুট সুন্দর; সেখানেই পায়চারি করছি। কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরে দেখা যায় একটা ঘর, কার্পেট চিত্রিত তার মেজে; খুব সম্ভব বৈঠকখানা। পুরোনো ফ্যাশনের একটা পিয়ানো ও মোটা মেহেগণী ফ্রেমের আঁটা ছবি। এই হ'ল সব কিছু। প্রাচীন ফুলবাগানে জীর্ণশীর্ণ কয়েকটি পিয়াল ও পপি, রক্তিম শুভ্র মাথাগুলি তারা তুলে আছে ঘাসের উপর। গরু ছাগলে মুড়ানো ম্যাপল ও এলম চারাগুলি পথের পাশে জড়াজড়ি ক'রে আছে। বাগানে গাছের এত ভিড় যে ঢোকাই দায়! কিন্তু এই হল ঘরের সামনেটা,—একদিন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পপলার সারি ও লাইমগাছের বীথি। আজ তার এই শেষ দশা! আর একটু এগোলে বাগানের মধ্যে একটা সাফ জায়গা। এখানে রাখা হয় শুকনো খড়। জায়গাটা ফাঁকা; এখানে চলতে গেলে চোখে মুখে এসে মাকড়শার জাল লাগে না। মৃদু মৃদু হাওয়া বইছিল।

ক্রমেই সামনে সব খোলা। এখানে আছে প্লাম, চেরী ও ঝাঁকড়া আপেল চারা। পোকায়-ধরা পিয়ার গাছগুলি নির্বিবাদে এত লম্বা হয়ে উঠেছে যে তাদের আর পিয়ার ব'লেই চেনা যায় না। বাগানের এই দিকটা এক দোকানদারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। চোর বা ষ্টার্লিং পাখীর উপদ্রব থেকে পাহারা দেবার জন্য ভীষণদর্শন এক কিষাণ থাকে একটা কুঁড়েতে।

বাগানটী ক্রমেই ফাঁকা হয়ে এসে একটা প্রান্তরের সংগে মিশে গেছে; প্রান্তরটাও ঢালু হয়ে এলিয়ে পড়েছে নদীর কোলে। নদীর তীরে তীরে চলেছে ঝাড়-জংগলের সমারোহ! পেষণযন্ত্রের কাছে একটা গভীর পুকুর, মাছে ভরা। খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ছোট্ট কারখানায় কাজ চলছে ভীষণ শব্দে, ব্যাঙ্‌গুলি উচ্চরোলে ডাকছে চারপাশে। পুকুরে কাচ স্বচ্ছ জলে মাঝে মাঝে চঞ্চল বৃত্তরেখা বিস্তৃত হ'তে হ'তে মিলিয়ে যাচ্ছে বার বার, শালুক লতা কাঁপছে চঞ্চল মাছের লেজের নাড়ায়। নদীর ওপারে ছোট্ট একটা গাঁ—ত্র্যবেত্‌স্নিয়া। পুকুরটীর জল শান্ত নীল, ওর বুকের ভিতরে নামলে যেন জুড়িয়ে যাবে সমস্ত প্রাণ। অথচ এই সব কিছু—পুকুর. কারখানা, বাঁধ—সমস্তই আজ এঞ্জিনীয়ারের দখলে।

এবার নতুন কাজ স্থরু হ'ল আমার। তার পাই, তার পাঠাই, নানারকম রিপোর্ট লিখি। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ফর্দ, যত সব অনুযোগ-অভিযোগ এবং ফোরম্যান বা কুলি দিয়ে আফিসে পাঠানো রিপোর্ট—এই সমস্ত কিছুর নকল রাখি। তবে দিনের বেশীর ভাগেই করিনা কিছুই। ঘরের মধ্যে পায়চারী করি শুধু টেলিগ্রাফের প্রতীক্ষায়। কখনো আমার আসনে একটা ছেলেকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ি বাগানে। তার যন্ত্রে শব্দ হচ্ছে টক্কর, টক্কর,—ছেলেটী

খবর দিলেই তবে ঘরে ফিরি। খাওয়া দাওয়া করি মাদাম শেপ্রাকভের ওখানে, মাংস জোটা ভাগ্যের কথা, প্রায় সব খাবারই দুধের। বুধ ও শুক্রবার তো উপোসের দিন। মাদাম শেপ্রাকভ্ তখন চোখ মিট মিট করেন কেবল,—এ তাঁর চিরদিনকার অভ্যাস। তাঁর সামনে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার।

সামনের ঘরে শেপ্রাকভ্ বিনা কাজে ব'সে ব'সে ঝিমোয় শুধু, অথবা বন্দুকটা নিয়ে পুকুরে যায় হাঁস-শিকারে। সন্ধ্যা হ'তেই মদে বুঁদ হয়ে আসে সে গাঁ থেকে বা ষ্টেশন থেকে। ঘুমোবার আগে আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে সে—"কি হে শেপ্রাকভ্, বলি চলছে কেমন?"

মাতাল অবস্থায় সে বড় মুষড়ে পড়ে, হাত ঘষতে ঘষতে হাসতে থাকে ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি স্বরে। বাহাদুরী দেখানোর ভঙ্গীতে সমস্ত জামাকাপড় খুলে রেখে গাঁয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সে আস্তো দিগম্বর; পোকা ধ'রে ধ'রে খায় আর বলে—"বড্ডো টক লাগছে!"

(চার)

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে সে হাঁপাতে হাপাতে ঘরে ঢুকে বললো—"শিগ্‌গির এসো. তোমার বোন এসেছে।" বেরিয়ে এলাম—বড় বাড়ীটার সামনেই একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে। আমার বোন এসেছে অনীতা ব্লাগোভোকে নিয়ে, সাথে সামরিক পোষাক পরা এক ডাক্তার।

আমাকে তারা বনভোজে নিতে এসেছে। আমার বোন ও অনীতার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল কেমন আছি আমি, কিন্তু নীরবে তারা আমার

দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু। আমিও নীরব। তারা বুঝলো যে এখানে আমার ভাল লাগছে না। বোনের চোখে জল এল, আর অনীতার মুখখানিও কেমন মলিন হয়ে উঠলো।

বাগানে এলাম সবাই। ডাক্তার আগে আগে। হঠাৎ সে ব'লে উঠলো—"বাঃ, কী চমৎকার হাওয়া!"

দেখতে এখনো সে একজন ছাত্রের মতোই। চলাফেরা ও কথা বলার ভঙ্গীও ছাত্রের, তার ধূসর চোখের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টিও ঠিক ছাত্রের মতোই। দীর্ঘাঙ্গী তার সুন্দরী বোনের পাশে তাকে দেখাচ্ছিল বরং কিছুটা হাল্কা ও ছিপছিপে। তার গোঁফ দাড়ি উঠেছে সবেমাত্র; গলার স্বর ক্ষীণ, কিন্তু মিষ্টি। সৈন্য বিভাগে কাজ করে সে, ছুটিতে বাড়ী এসেছে। শরৎকালে সে এম, ডি পরীক্ষা দিতে যাবে পিটার্সবার্গে। ঘর সংসারে জড়িয়ে পড়েছে সে ইতিমধ্যেই,—তিন ছেলে-মেয়ে আর বৌ; বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। এখন সবার মুখেই শোনা যায়—খুব পারিবারিক অশান্তিতে আছে সে, বৌয়ের সংগে থাকে না।

কেমন উদ্বিগ্নভাবেই আমার বোন জিজ্ঞেস করছিল—"কটা বাজে? সময় থাকতে ফিরতে হবে আবার। ছ'টার আগেই ফিরবো এই চুক্তিতেই বাবা আসতে দিয়েছেন।"

"রাখো না তোমার বাবার কথা!"—ডাক্তার যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

উনুন ধরালাম। বড় ঘরটার বারান্দায় কার্পেট পেতে খাওয়া হ'ল চা। খুব আরাম ক'রে চা খেতে খেতে ডাক্তার ব'লে উঠলো—"আঃ, একেই বলে আরাম।" শেপ্রাকভ এবার চাবি নিয়ে এসে কাঁচের দরজাটা খুলে দিলে আমরা সবাই ভেতরে এলাম। আধো

অন্ধকারময় একটা রহস্যের মতোই ভেতরটা, ব্যাঙের ছাতার গন্ধ আসছে। আমাদের পায়ের শব্দ শোনাচ্ছে কেমন ফাঁপা, মেঝের নীচেটা যেন খালি। ডাক্তারের হাত লাগতেই পিয়ানোর ঘাটগুলি বেজে উঠলো কম্পিত মিঠে স্বরে। গলা মিলিয়ে গাইলো সে এবং কোনো ঘাট না বাজলে ভ্রূকুটি ক'রে মেজেতে পা ঠুকলো কেবল। আমার বোন বাড়ী ফিরবার কথা উল্লেখ ক'রে ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে বলছিল বারবার ঃ

—"কী যে ভালো লাগছে আমার, কী যে ভালো!"

তার কণ্ঠস্বরেও যেন একটা বিস্ময়ের সুর,—সেও যে খুশিতে হাল্‌কা হয়ে উঠতে পারে এটা যেন তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। জীবনে এই প্রথম তাকে এত খুশি দেখলাম। সত্যিই বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। এক দিক থেকে দেখলে তার চেহারা অবশ্যি সুন্দর দেখায় না, নাক ও মুখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে,—কেমন যেন বিরক্তি ভরা। তবে চোখ দুটী খুবই সুন্দর; কেমন ব্যথা-মলিন তার রঙ্, ব্যথা-ভরা সুন্দর একটি প্রাণের ছায়া তার সর্বাঙ্গে! কথা বলার সময় বড় রমনীয় দেখায় তাকে। আমি ও আমার বোন দুজনেই পেয়েছি মায়ের চেহারা। শক্ত গড়ন আমাদের, সহ্যশক্তিও যথেষ্ট, কিন্তু বোনের মলিন রঙ্‌টা তার খারাপ স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, প্রায়ই কাশে সে। তার মধ্যে ধরা পড়ে কঠিন রুগীর মতো একটা ভাব,—সে যেন তা লুকিয়ে ফিরছে; কিন্তু আজ তার চালচলনে ও চেহারায় জেগে আছে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য, কেমন ছেলেমানুষি আমেজ। শিশুকাল থেকে কঠিন শিক্ষা ও কড়া শাসনের চাপে যে আনন্দ এতদিন ধ'রে মৃতপ্রায় হয়ে ছিল—আজ যেন তা হঠাৎ বুকের মধ্য থেকে জেগে উঠলো, খুঁজে পেল বাঁধভাঙা পথ।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার গাড়ী আনা হলেই বোন আবার নীরব হয়ে গেল, সে যেন দ'মে গেছে; শীর্ণ হয়ে গেছে তার উৎফুল্ল দেহ। গাড়ীতে গিয়ে ওঠার সময় তার মুখ দেখে মনে হ'ল সে যেন ফাঁসী-কাঠেই ঝুলতে যাচ্ছে!

সবাই চ'লে গেছে, দূরে মিলিয়ে গেছে গাড়ীর শব্দ……হঠাৎ মনে হ'ল অনীতা ব্লাগোভো একটা কথাও তো বলেনি আমার সঙ্গে। কী চমৎকার মেয়েটি, সত্যিই চমৎকার!

সেণ্ট পিটার উৎসব এল,—কিন্তু সেই মামুলি খাবার ছাড়া নতুন নেই কিছুই। অলস জীবনের ক্লান্তি ও নিজের অব্যবস্থিত অবস্থা—সব মিলে নিজের উপরেই অসন্তুষ্ট ছিলাম। ক্ষুধার্ত হয়ে অস্থিরভাবে ঘুরছিলাম বাগানে,—ভাবছিলাম, এখান থেকে ছুটি নেবার সুবিধামতো একটা ফাঁক পেলেই হয়।

একদিন সন্ধ্যার দিকে রাদিশ ব'সে আছে ঘরে,—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকলেন ডলঝিকভ—রোদে পোড়া ধুলোয় ধূসর দেহ। তিনদিন জমিদারী দেখে ষ্টিমারে এখন দ্যুবেত্‌স্নিয়াতে এসেছেন, ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে। শহর থেকে গাড়ী আনার প্রতীক্ষা করতে করতে তিনি কর্ম্মচারীদের উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিচ্ছিলেন নানারকম, তারপর আবার আমার ঘরে ব'সে লিখতে সুরু করলেন। ঘরে থাকতেই তার এল, নিজেই উত্তর জানালেন। আমরা তিনজন সোজা দাঁড়িয়ে আছি নিঃশব্দে।

"কী সব মাত্‌লামো"।—একটা রেকর্ড বইর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—"দিন পনেরোর মধ্যেই অফিস আমি ষ্টেশন থেকে সরিয়ে নিচ্ছি। যতো অসুবিধার গোড়ায় তো তোমরাই!"

"কিন্তু দয়া ক'রে শুনুন, আমার সাধ্যমতোই কাজ করছি আমি।"

"হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মাইনে গুনে নেওয়া!"—এঞ্জিনীয়ার ডলঝিকভ ব'লে চললেন আমার দিকে নজর রেখে—"ভাবছে, খোসামোদ ক'রে কাজ হাঁসিল ক'রে নেবে। তোষামোদের ধার ধারি না আমি। আমার জন্য কাউকেই মাথা ঘামাতে হয়নি কোনোদিন। এই রেল-কন্ট্রাক্টের আগে মিস্ত্রী হিসেবে কাজ করেছি, অয়েলার ছিলাম বেলজিয়ামে। হ্যাঁ, আর তুমি—হাঁদারাম, তুমি এখানে ব'সে ব'সে কার চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করছো?" রাদিশকে জিজ্ঞেস করলেন—"ওদের সংগে জুড়ি দিয়ে মদ গিলছো তো?"

জানি না কোন খেয়ালবশে তিনি নম্র প্রকৃতি ভদ্রলোকদের ডাকতেন হাঁদারাম! আমার ও শেপ্রাকভের মতো লোককে ঘৃণা করতেন এবং মুখের উপরেই ব'লে দিতেন—মাতাল, জানোয়ার, ছোটলোক। বিনীত কর্মচারীদের কাছে তিনি যমস্বরূপ; নিজের খেয়াল মতো তাদের জরিমানা করেন, তাড়িয়ে দেন বিনা কৈফিয়তে!

শেষ পর্যন্ত গাড়ী এল এবার। বিদায়কালে তিনি শপথ করতে করতে বললেন যে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাড়িয়ে দেবেন সবাইকে, নিজের জমিদারীর নায়েবকে বললেন 'অপদার্থ' এবং গাড়ীতে ব'সে আরামে দেহ এলিয়ে দিয়ে হেলে দুলে চললেন শহরের মুখে।

"আন্দ্রে আইভানভিচ, আমাকেও মজুর ক'রে নাও।"—রাদিশকে বললাম।

"আচ্ছা বেশ!"

শহরের মুখে রওনা হলাম আমরা। একে একে পিছিয়ে গেল স্টেশন ও বড় বাড়ীটা। আন্দ্রেকে জিজ্ঞেস করলাম—"আজ সন্ধ্যায় দ্যুবেচ্‌ন্যিয়াতে এসেছিলে কেন?"

"প্রথমত, আমার লোকজন লাইনের কাজে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সুদ দিতে এসেছিলাম জেনারেলের স্ত্রীকে। গত বছর পঞ্চাশ রুবল ধার করেছি, প্রতি মাসে সুদ গুণতে হয় এক রুবল।"

রাদিশ থামলো ও আমার বোতাম ধ'রে আবারও বলতে লাগলো, "মিজেইল, বন্ধু হে! আমার কথা হচ্ছে—কেউ যদি একটা পয়সাও সুদ নেয় তো অন্যায় করে সে। এমন লোকের মধ্যে সত্যের স্থান নেই!"

রাদিশ শীর্ণদেহ মলিন মানুষ, দেখলেই ভয় লাগে তাকে। সে চোখ বুজে মাথা নাড়তে নাড়তে দার্শনিকদের মতো গম্ভীরভাবে বলতে থাকে,—

"পোকায় খায় ঘাস, মরচে খায় লোহা, মিথ্যা কথা খায় আত্মাকে। ভগবান যিশু, আমরা পাপী, আমাদের ক্ষমা করো।"

(পাঁচ)

ব্যবহার বুদ্ধির অভাব রাদিশের, হিসেব বোধ নেই তার মোটেই। নিজের শক্তিতে যা কুলোয় তার অনেক বেশী কাজ সে হাতে নেয়, হিসাব মিলাতে মাথা যায় গুলিয়ে; শেষ পর্যন্ত কাজ তুলতে নিজেরই পকেট হয় ফাঁক। রঙ করা, বার্ণিশ করা, কাগজ লাগানো, এমন কি, ছাদে টালি বসানোর কাজও নেয় সে। মনে আছে আমার,—একবার একটা ছোট্ট কাজের খাতিরে সে টালিদারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেছে পুরো তিনটা দিন। পয়লা নম্বর মজুর সে, এমন কি দশ রুবলও সে রোজ আয় করে। প্রভুত্ব করার বাসনা কিম্বা ঠিকাদার নামের মোহ তাকে অমন ক'রে পেয়ে না বসলে সে রোজগার করতে পারতো আরও প্রচুর। নিজে টাকা পেত সে ঠিকা কাজের

শেষে, কিন্তু অন্য মজুরদের দিত রোজ বাবদ—দু এক পেন্স থেকে দু শিলিং পর্যন্ত। আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা বাইরের কাজ করতাম—প্রধানত ছাতে রঙ-করা। প্রথম প্রথম এই কাজে গিয়ে পা পুড়ে উঠতো,—জলন্ত ইঁটের উপর দিয়েই যেন চলাফেরা করছি, বুট পড়লে দশা হ'ত আরও করুণ। কিন্তু দিনে দিনে স'য়ে গেল সবই,—স্বচ্ছন্দেই চলতে লাগলো এই জীবন। এখানকার সবার কাছেই শ্রম হচ্ছে বাধ্যতামূলক, অপরিহার্য,—খাটেও তারা কলুর বলদের মতো। পরিশ্রমের যে একটা নৈতিক মর্ম আছে এই বোধটুকুও তাদের মধ্যে জন্মাবার অবকাশ নেই। 'শ্রম' শব্দটা তাদের কাছে এত অপ্রীতিকর যে তাদের কথাবার্তায় কখনও ঐ শব্দটি ব্যবহার করতে শুনিনি। তাদের পাশে আমাকেও ঠেকতো কলুর বলদের মতো, যা করছি তা যেন ঠেকেই করছি। স্বাধীন শ্রমশক্তির দ্বন্দ্বময় চেতনা আমার মধ্যে ম'রে আসছিল ক্রমেই। ফলে জীবনটা সহজ হয়ে আসছিল একদিক দিয়ে, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংশয় থেকেও মুক্তি পাচ্ছিলাম।

প্রথমে কিন্তু বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছিলাম সবকিছুতেই, সবকিছুই নতুন। এ যেন আমার নবজন্ম! ঘুমোতাম মাটিতেই, ঘুরে বেড়াতাম খালি পায়ে,—কী যে ভালো লাগতো! মজুর কিষাণের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটুও অস্বস্তি বোধ করতাম না। নিজেকে কারো থেকেই আলাদা মনে হ'ত না। রাস্তায় কোনো গাড়ীর ঘোড়া প'ড়ে গেলে নিঃসংকোচে ছুটে যেতাম তুলে দিতে; কাপড়-চোপড়ে কাদা লাগার ভয় হ'ত না। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল—তখন দাঁড়িয়েছি আমি নিজেরই পায়ের উপর,—আমি বোঝা নই কারও!

নিজেদেরই তেলে রঙে ছাদ রঙ করার কাজ বেশ লাভজনক। তাই কঠিন কাজেও আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট,—এমন কি রাদিশের মতো অত

দক্ষ লোকেরও ঝোঁক ছিল এদিকে। হাফ্-প্যান্ট প'রে লম্বা সরু পায়ে সে যখন নানা কাজে ঘুরে বেড়াতো ছাতের উপর দিয়ে—তাকে দেখাতো ঠিক একটা সারসের মতোই। শ্বাস টানতে টানতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো সে, শুনতে পেতাম,—"হায়, পাপী আমরা, অভিশপ্ত জীবন আমাদের।" ছাতের কিনারা দিয়েও এমন নিশ্চিন্ত চিত্তে হাঁটতো যে দেখে মনে হ'ত সে হাঁটচে যেন মাটির উপরেই। আমাদের কেমন ভয় লাগতো। তার চেহারা আর সবার মতো শীর্ণ হ'লেও তৎপরতা তার বিস্ময়কর। গির্জার চূড়া বা গম্বুজে রঙ করে সে নির্ভীক এক তরুণের মতোই, শুধু একখানা মই আর দড়ির সাহায্যে এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে এভাবে কাজ করা সত্যিই কী সাংঘাতিক, কী বিপজ্জনক! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে কাজ করতো আর বলতে থাকতো,—"পোকায় খায় ঘাস, মরচে খায় লোহা, আর মিথ্যে কথা খেয়ে ফেলে আত্মাকে।"

অথবা কোনো কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই জবাব দিয়ে উঠতো—

"এক্ষুণি যে-কোনো কিছু ঘটতে পারে, যে-কোনো কিছু এক্ষুণি!" কাজের শেষে বাড়ি ফিরি। তখন গেটের পাশে বেঞ্চিতে ব'সে থাকে লোকজন,—দোকানদার, ছেলের দল ও বাবুরা। তারা আমার উপর ঘৃণা বর্ষণ করতে থাকে, নানাভাবে বিদ্রূপবাণ হানে। প্রথম প্রথম আমার মেজাজই বিগড়ে যেত, পাশবিক মনে হ'ত এই সমস্ত ব্যবহার।

চারদিক থেকেই আমার অভ্যর্থনা শুনতাম "ঐ যায় নাই-মামার-চেয়ে-কাণা-মামা, ঐ যায় রঙদার, আমাদের হলদে পাখী!" কিছুদিন আগেও যারা ছিল একান্ত দীন জীব, দিনরাত খেটে খেটে জোগাড়

করতো যারা একমুঠো পেটের অন্ন—আজ তারাই আমার সংগে ব্যবহার করতে লাগলো অত্যন্ত অভদ্রের মতো। একবার একটা রাস্তা দিয়ে চলছিলাম, এক ধোবা হঠাৎ আমার গায়ে ছুঁড়ে মারলো এক বালতি জল। আর একবার একটা লোক লাঠি নিয়েই আমাকে তেড়ে এল রাস্তায়। এক বুড়ো মেছো তখন পথ আগলে দাঁড়িয়ে রাগে গশ্‌গশ্‌ ক'রে আমাকে বলতে লাগলো :

"তোমার জন্যে দুঃখও হয় না, অপদার্থ কোথাকার! দুঃখ হয় তোমার বাবার জন্যে!"

পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা আমার সংগে দেখা হ'লেই কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। কেউ ভাবে আমাকে বিচিত্র একটি জীববিশেষ, কেউ ভাবে অপদার্থ গর্দভ, কেউ-বা দুঃখ জানায়। আরও অন্যেরা ঠিক ক'রে উঠতে পারে না আমার সংগে কিভাবে ব্যবহার করবে,—সত্যিই এদের বোঝা দায়। একদিন অনীতা ব্লাগোভো-র সংগে দেখা গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে। কাজ করতে যাচ্ছিলাম আমি, হাতে বড় বড় দুটো ব্রাস ও রঙের একটা বালতি। এ অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়েই অনীতা লাল হয়ে ওঠে।

"দেখুন' দয়া ক'রে রাস্তার মাঝে ওরকম নমস্কার করবেন না।"—একটু কর্কশভাবেই বললো; তার গলা কাঁপছিল, সে একেবারেই বিব্রত হয়ে পড়লো। সে আমার দিকে তার হাতখানা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল না,—হঠাৎ অশ্রু উছলে উঠলো তার চোখের কোণে কোণে—"আপনারা যদি বুঝে থাকেন এই এমনিভাবেই জীবনযাপন করা দরকার···তাই হোক···তবে তাই হোক···আমার সংগে দেখা করবেন না—অনুরোধ করছি আপনাকে।"

গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে এখন আর থাকি না আমি, থাকি

শহরতলীতে আমার বুড়ী ধাইমা কার্পোভনার সংগে। এই মনমরা বুড়ীটি সবসময়ই কিছু না কিছু অমঙ্গল দেখে চারদিকে, স্বপ্ন দেখলে পর্যন্ত ভয়ে কাঁপতে থাকে। এমন কি, তার ঘরে বোলতা বা ভীমরুল উড়ে এলেও সে দেখতে পায় অমঙ্গলের ছায়া। আমি যে মজুর হয়েছি এটাও তার কাছে অমঙ্গলেরই সূচনা।

"সর্বনাশের পথে চলছো তুমি!—" মাথা নাড়তে নাড়তে বলতো সে—"সর্বনাশের পথে!"

সে পোষ্যপুত্র রেখেছে প্রোকোফিকে। বছর ত্রিশেক বয়স তার, মাথাভরা লালচুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ—যেন একটা বিরাট জানোয়ার। গোঁফজোড়া বাহাদুর গোঁফ, পেশা তার কসাইগিরি। ছোট্ট একটা ঘরে সে কার্পোভ্‌নার সংগে থাকে। আমার সংগে দেখা হ'লে মহাসম্ভ্রমে সে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, মাতাল হ'লে স্যালুট করে পুরো পাঁচটা আঙুলে! সন্ধ্যাবেলায় খাওয়াদাওয়ার পরে সে মদ গিলতে থাকে গ্লাসের পর গ্লাস, আর কেবল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আমার ঘরের দেয়ালের ওধারে স্পষ্ট শুনতে পাই তার চাপা গলার 'মা' ডাক। কার্পোভ্‌না ছেলের গলা শুনেই গ'লে যায়—"কি বাবা, কি মাণিক!"

"তোমাকে কত যে ভালবাসি আমি! একটা প্রমাণ দেখাবো, মা? তোমার মরণ পর্যন্তই আমি কাঁদবো তোমার জন্য। তুমি ম'রে গেলে আমার নিজের খরচেই কবর দেবো তোমাকে। আমার যে কথা সেই কাজ। দেখো, তুমি ঠিক দেখো।"

রোজ ঘুম থেকে উঠি সূর্যোদয়ের আগেই, শুতে যাই সকাল সকাল। আমরা এই চিত্রকর মজুরেরা খাই প্রচুর, ঘুমাইও মনের সাধে। রাতে একটিমাত্র অসুবিধা হয়, বুকটা বড় ধড়ফড় করতে থাকে। সংগীদের সংগে ঝগড়া করি না কখনও। তাদের মধ্যে দিনরাত

সমানে চলতে থাকে, জঘন্য শপথ, বাপ মা তুলে গালাগাল এবং মধুর সব কামনা যথা "কলেরায় নিক!" "চোখের মাথা খা!" ইত্যাদি। সে যা হো'ক, মিলেমিশেই ছিলাম আমরা। সবাই আমাকে ভাবতো ধার্মিক গোছের কিছু একটা এবং আমাকে নিয়ে সরল পরিহাসও চালাতো খুব। তারা বলতো বাপের ত্যাজ্যপুত্র আমি। সংগে সংগে নিজেদের কথাও বলতো, গিজামুখো হয়নি তারা পূরো এই দশ বছর। কারণ, পাখীর মধ্যে দাঁড়কাক আর মানুষের মধ্যে রঙদার—এই দুইই সমান।

আমার উপরে সবারই ভাল ধারণা. আমাকে সমীহ ক'রেই চলে তারা। আমি যে মদ খাইনা, তামাক খাইনা, শান্ত ভাবে জীবন কাটাই—এতে ভারী খুশি তারা। আমি যে তাদের নিত্যকার তেলচুরির মধ্যে নেই—বা কর্তাবাবুদের কাছ থেকে মদের পয়সা খয়রাত্ চাওয়ার মধ্যে নেই—এগুলিই তাদের মনকে নাড়া দিয়েছে ভয়ানকভাবে। কর্তাদের তেল ও রঙ চুরি করা একটা সনাতন রীতি এবং এটাকে চুরি ব'লেই গণ্য করা হয় না। তবু এটা খুবই লজ্জাকর বিষয় যে, রাদিশের মতো অমন একজন সাঁচ্চা লোকেও প্রত্যেকদিনই বাড়ী ফেরার সময় সংগে নিয়ে যায় বালতিভর্তি তেল ও রঙ। এমন কি খুব সম্ভ্রান্ত লোক, শহরতলীতে যার নিজেরই বাড়ী আছে সেও খয়রাতি খরচ চাইতে লজ্জা বোধ করে না। সমস্ত কাজের প্রারম্ভে বা শেষে সবাই মিলে 'ধন্না' দেয় এসে অপদার্থ কোনো অর্থশালী লোকের দোরে,—দু-একটি অনির লোভে প্রশংসা করতে থাকে নীচ পদলেহী ভাষায়। এসব দেখে বিরক্তিতে অপমানে মাথা কাটা যায় আমার। কর্তাদের সংগে তাদের আচরণ ঠিক রাজসভার চাটুকারদের মতোই। প্রায় দিনই আমার মনে প'ড়ে যায় সেক্সপিয়ারের পলোনিয়াসের কথা।

'মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে আজ!'—যার বাড়ী রঙ্ করা হচ্ছে সেই গৃহকর্তা আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো বললেন।

"যে আজ্ঞে কর্তা, ঠিকই বৃষ্টি হবে।"—রঙ্দারেরা সবাই একমত।

"কিন্তু বর্ষার মেঘ ব'লে মনে হচ্ছে না তো! বোধহয় বৃষ্টিই হবে না শেষ পর্যন্ত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যথার্থ বলেছেন। কিছুতেই আজ বৃষ্টি হবে না—এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

কিন্তু এইসব লোকই আবার প্রভুদের পিঠের আড়ালে নানারূপ বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। যেমন, বারান্দায় ব'সে কোনো বাবু পত্রিকা পড়ছেন দেখলেই অম্নি এরা মন্তব্য করবে,—

"বাবু তো পত্রিকা পড়ছেন, কিন্তু ঘরে নিশ্চিতই হাঁড়ি চড়েনি আজ!"

আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখতে কখনোই বাড়ী যেতাম না আমি। কাজ থেকে ফিরে কখনো কখনো অশুভ চিঠি পেতাম। বোন বাবার কথা লিখেছে: 'খাবার সময় আনমনা ছিলেন অত্যন্ত, কিছুই খাননি'; অথবা 'মন ও মেজাজ তাঁর খুবই খারাপ'। অথবা, 'আজ একটা ঘরে একলা আটক হয়ে ছিলেন অনেকঘণ্টা কাল।' এমনি ধরণের সব খবরে বিচলিত হয়ে উঠতাম,—ঘুমোতে পারতাম না। মাঝে মাঝে রাতে এসে পায়চারি করতে থাকতাম গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি স্ট্রীটে—আমাদের সেই বাড়ীটার সামনে। তাকিয়ে থাকতাম জানলার বাইরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে,—সবাই কুশলে আছে তো? বরাবরই বোন দেখা করতে আসে, কিন্তু গোপনে আড়াল দিয়ে—সে যেন আমার সংগে দেখা নয়! যদি বা আমার কাছে আসে, এত করুণ

দেখায় তাকে! চোখের কোণে কোণে অশ্রুর দাগ! এসেই সে কাঁদতে থাকে,—

"এবারে বাবা আর বাঁচবেন না বেশীদিন; ভগবান না করুন,—একটা কিছু যদি হয় তো—তোমার বিবেক সমস্ত জীবনই তোমাকে ধিক্কার দিতে থাকবে। এ যে সাংঘাতিক, মিজেইল! আমার স্বর্গগতা মায়ের নাম ক'রে অনুরোধ করছি তোমাকে—তোমার চালচলন ফেরাও।"

"কিন্তু বোন"—আমি বলতাম—"যদি বুঝি যে ঠিক পথেই চলছি, তবে কি ক'রে জীবনধারা বদলাই বলো? বুঝে দেখো, বোন!"

"তুমি বিবেকমতে চলছো বুঝতে পারছি, কিন্তু অন্যভাবেও হয়তো চলা যায়,—এমন কোনো পথে যাতে কারো মনেই আঘাত লাগে না।"

ওদিকে দোরের ওপাশেই বুড়ী ধাই-মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে—"হা ভগবান। সর্বনাশের পথে চলছো তুমি। কী সাংঘাতিক, সোনার ছেলে, ওঃ তোমার এই দশা!"

(ছয়)

হঠাৎ একদিন ডাক্তার ব্লাগোভো এসে উপস্থিত। সিল্কসার্টের উপরে সামরিক পোষাক, পায়ে উঁচু বুট।

"তোমার সংগে দেখা করতে এলাম"—ঠিক ছাত্রের মতোই উৎসাহ-ভরে করমর্দন করতে করতে বললো সে—"রোজই তোমার কথা শুনছি আমি। আসবো আসবো ভাবছিলাম, তোমার সংগে প্রাণ খুলে একটু কথা বলবো। শহরের একঘেয়েমি কী যে ভয়ংকর। এমন একটা মানুষ নেই যে গিয়ে একটু কথা বলি। ইস্, বেশ গরম পড়ছে তো!"

সামরিক পোষাকটা খুলে সার্টটা গায়ে রেখে বসলো সে—"কি হে, তোমার সংগে একটু আলাপ-সালাপই করা যাক।"

নিজেকেও বড় নির্জীব ও একঘেয়ে লাগছিল; বহুদিন থেকেই সহকর্মীদের ছাড়া কারো সংগে একটুখানি কথা বলার জন্য লালায়িত হয়ে ছিলাম। ডাক্তারকে পেয়ে ভারী খুশিই হয়ে উঠলাম।

"এই ব'লেই আমি আজ সুরু করবো"—আমার বিছানায় শুয়ে প'ড়ে সে বলতে লাগলো—"আন্তরিক ভাবেই তোমাকে সমর্থন করছি, গভীরভাবে শ্রদ্ধা করছি তোমার জীবনধারাকে। এখানে শহরে তোমাকে বোঝে না কেউ, সত্যিই বোঝে না কেউ। নিজেই তো জানো কী ধরণের জীব তারা। কিন্তু সেই বনভোজনের দিনই চিনে ফেললাম্ তোমাকে। উদার প্রাণ তোমার, উচ্চ আদর্শ। আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি তোমাকে এবং তোমার হাতে হাত দিয়ে গৌরব অনুভব করি।"—উৎসাহ ভরে ব'লে চললো সে, "বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তোমার জীবনে সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন আনার পথে নিশ্চয়ই তোমাকে কঠিন মানসিক সংঘাত সহ্য করতে হয়েছে এবং এখনও এইভাবে জীবন-যাপন করতে ও তোমার বিশ্বাসকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে অচঞ্চলভাবে রক্ষা করতে নিশ্চয়ই প্রতিদিন নিজের সংগে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আলোচনা সুরু করতে হ'লে—আচ্ছা বলো তো, তোমার কি মনে হয় না যে তোমার এই অদম্য মানস-শক্তি, কঠিন কর্মদক্ষতা—এই সমস্ত কিছুই যদি তুমি অন্যকিছুর উপরে নিয়োগ করতে,—এই ধরো বিরাট এক বৈজ্ঞানিক বা শিল্প প্রচেষ্টায়—তাহ'লে তোমার জীবন কি আরও গভীর—আরও সার্থক হ'য়ে উঠতো না?"

আমরা আলোচনা করতে লাগলাম এবং শারীরিক শ্রমের প্রসংগ উঠলে এই কথাটা আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম: পৃথিবীতে এটাই

হ'ল মানুষের কাম্য যে শক্তিমান দুর্বলকে অত্যাচার করবে না,—মুষ্টিমেয় লোক বিরাট জনগণের কাঁধের উপর পরগাছার মতো নিশ্চেষ্ট আরামে জীবনযাপন করবে না, বা রক্তচোষার মতো তাদের সমস্ত প্রাণশক্তি চুষে নেবে না। অর্থাৎ সবল দুর্বল কাউকেই বাদ না দিয়ে—ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে নিজ নিজ পথে জীবনযুদ্ধে অংশ নেবে। সবকিছুর মধ্যে সমতা আনতে শারীরিক শ্রমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো পথই নেই। এই শারীরিক শ্রম হ'ল বিশ্বজনীন সেবাধর্ম, প্রত্যেকের পক্ষেই এ হ'ল জীবনের বাধ্যতামূলক অপরিহার্য অংশস্বরূপ।

"তাহ'লে তুমি কি মনে করো যে, প্রত্যেকে—এমন কি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পর্যন্ত এই জৈব যুদ্ধে অংশ নেওয়া উচিত,—তাদের অমূল্য জীবন তারা নষ্ট করবে পাথর ভেঙে, ছাত গ'ড়ে? সে যে হবে প্রগতি পথেরই একটা মারাত্মক বিপদ?"

"বিপদ কোথায়? প্রগতি হ'ল প্রেমের কাজে মানবিক ধর্ম সম্পাদনে। কাউকে যদি তুমি দাসত্বে না বাঁধো, তবে তার চেয়েও বড় প্রগতি কী চাও তুমি?"

"কিন্তু মাফ করবে আমাকে"—ব্লাগোভা হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে উঠলো—"তানয়,—একটা শামুক যদি তার খোলের মধ্যে ব'সে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত থাকে এবং নৈতিক ধর্মের নামে অপব্যয় করে বুদ্ধিবৃত্তির, তাকেও কি বলবে তুমি প্রগতি?"

"অপব্যয় কেন?"—অসন্তুষ্টভাবেই বলছিলাম—"খাওয়া-পরার জন্যে তোমার প্রতিবেশীর কাঁধের উপর তুমি যদি চেপে না বসো—তা' হ'লে দাসত্বময় এই জীবনেও তা নিশ্চিতই প্রগতি। আমার মনে হয়, এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতি এবং সম্ভবত মানুষের পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য প্রগতি।"

"বিশ্বজনীন প্রগতি হ'ল সীমাহীন,—আমাদের প্রয়োজন বা সাময়িক কোনো মতবাদে সীমাবদ্ধ কোনো সম্ভাব্য প্রগতি,—মাফ কোরো,—এ একেবারেই অদ্ভুত বস্তু!"

"প্রগতির সীমা যদি হয় অসীমে, তুমি যেমন বলছো, তা হ'লে সোজাই বোঝা যাচ্ছে তার নির্দিষ্ট কোনো আদর্শই নেই। কি জন্যে যে বেঁচে আছি তা না জেনেই বেঁচে থাকা!"

"হ'ক না তাই! কিন্তু সেই না-জানাটাই তোমার ঐ জানার মতো বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে নয়। একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আমরা,—নাম তার প্রগতি সভ্যতা সংস্কৃতি যাই বলো না কেন। কোথায় যে যাত্রা তা না জেনেই আমরা ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে অভিযান করছি। ঐ সুন্দর সোপানগুলির জন্যেই বেঁচে থাকা সার্থক। আর তুমি? তুমি জানো, তোমার জীবনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য;—তুমি বেঁচে আছ এই আদর্শে যে, একদল মানুষ যাতে অন্য সবাইকে দাসত্ব শৃংখলে বাঁধতে না পারে,—সমানভাবে খেতে পারে শিল্পী ও সাধারণ মানুষ। কিন্তু জানবে তুমি,—এটা হচ্ছে তুচ্ছ, বুর্জোয়া—এই যাকে বলে বস্তুজগতীয় দিক,—জীবনের ধূসর দিক। শুধু এর জন্যই বেঁচে থাকাটা অপমানজনক, আপত্তিকর। একটা পোকা যদি আর একটার উপর চড়াও হয়, হোক না—খাওয়া-খাওয়ি ক'রে মরুক না ওরা, ওদের কথা ভাববার দরকার নেই আমাদের। এ তো জানা-কথা ওরা মরবেই, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,—উৎসাহবশে যতই তুমি ওদের মুক্ত করতে যাও না কেন? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের কথাই ভাবা উচিত,—আমাদের প্রতীক্ষায় যারা দাঁড়িয়ে আছে ভবিষ্যত মহামানবের সাগর তীরে।"

একাগ্রভাবেই আলোচনা করছিল ব্রাগোভা; কিন্তু তখনই

থাপছাড়া কি একটা ভাবনায় সে যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠছিল,—তার মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

"তোমার বোন বোধহয় আসছে না আজ?"—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো সে—"কালকে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল সে, তোমার এখানে আজ আসবে বলেছিল। তুমি বলো দাসত্ব দাসত্ব……"—আবার ব'লে চললো সে,—"কিন্তু জানবে, সেটা হচ্ছে একটা বিশেষ প্রশ্ন এবং ক্রমে ক্রমে এমনি সকল প্রশ্নেরই সমাধান হয় ভবিষ্যত মানবের হাতে।"

ক্রমোন্নতির কথা আলোচনা করতে লাগলাম। আমি বললাম—"ভাল বা মন্দ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান ক'রে থাকে মানুষ নিজেই, ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে তা ভবিষ্যত মানব ক'রে দেবে ব'লে কেউ ব'সে থাকে না। উপরন্তু এই ক্রমোন্নতিরও নানা দিক আছে। মানুষের ধারণাশক্তির ক্রমোন্নতির সংগে সংগে জন্ম নেয় অন্য ধরণের নতুন নতুন ভাবধারা। ভূমিদাস প্রথা নেই আজ আর, কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে উঠছে নতুন ধনতন্ত্র। নতুন এই মুক্তি-যুগেও সংখ্যাগরিষ্ঠদের যারা ক্ষুধার্ত অর্ধনগ্ন ও অসহায়—তাদের খাওয়া-পরার জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে হয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের দিকে। এমনিধারা ব্যবস্থা তোমাদের যে কোনো উচ্চ ভাবধারা বা উদ্দেশ্যের সংগে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়; কারণ দাসত্বে বেঁধে রাখবার কায়দাও উন্নত হচ্ছে দিনদিন। আস্তাবলে ফেলে এখন আর আমরা চাকরদের পেটাই না, দাসত্বকেও দিয়েছি মার্জিত রূপ,—অন্তত প্রত্যেক ব্যাপারের পেছনেই বুদ্ধিক্রমে খাড়া ক'রে রাখি একটা না একটা যুক্তি বা কৈফিয়ৎ। ভাবধারা আমাদের কাছে ভাবধারাই মাত্র! যদি এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আমরা আমাদের শারীরিক শ্রমের সবচেয়ে

অপ্রীতিকর অংশ শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাবার সুযোগ পেতাম তো নিশ্চয়ই আমরা তাই করতাম এবং তারপরেই আবার অসংকোচে নিজেদের সমর্থন করতাম এই ব'লে যে,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরাই যদি এমনি সব বাজে বাজে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে ফেলেন —তবে প্রগতির সে তো মহাদুর্দিন।"

কিন্তু এই সময়ই আমার বোন এসে উপস্থিত হ'ল, ডাক্তারকে দেখে সে চিন্তিত হয়ে উঠলো এবং বলতে লাগলো যে তার বাবার নির্দেশমতো বাড়ী ফিরবার সময় পেরিয়ে গেছে।

"ক্লিওপাত্রা"—ব্লাগোভো আগ্রহের স্বরে বলছিল, হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ ক'রে রেখে—"তোমার ভাই ও আমার সংগে দুদণ্ড কাটিয়ে গেলে এরই মধ্যে তোমার বাবার কিছু এসে যাবে না।"

দিলখোলা মানুষ সে,—ভাল করেই জানে সে কি ভাবে নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্য অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে তুলতে হয়। মুহূর্তকাল কি ভেবে আমার বোন হেসে উঠলো। বনভোজনের দিনের মতোই সে খুশি হয়ে উঠলো। আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। শহরের মুখোমুখি হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলাম। শহরের পশ্চিমপ্রান্তের জানলাগুলি ঝলমল করছিল সোনার মতো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

এর পর থেকে আমার বোন এলেই ডাক্তারও আসতো। দেখা হ'তেই তারা এ-ওকে অভ্যর্থনা জানাতো,—যেন হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার ও আমি তর্ক করতাম, আমার বোন ব'সে ব'সে শুনতো। এমন সময় তার মুখখানা দেখাতো কেমন উজ্জ্বল, কোমল, ও কমনীয়,কেমন অসীম ঔৎসক্যে উন্মুখ! আমার মনে হচ্ছিল,—তার স্বপ্নরাজ্যের ওপারে আছে এক নতুন জগত—যেখানে আজ সে ডুব দিতে

চলেছে—তাই যেন ধীরে ধীরে তার সামনে এগিয়ে আসছে। ডাক্তার না এলে মলিনমুখে শান্ত মানুষটির মতো ব'সে থাকতো সে, আমার বিছানায় ব'সে আজকাল কখনো যদি সে চোখের জল ফেলে, তার কারণ কখনো আমাকে বলে না।

আগষ্ট মাসে রাদিশ আমাকে রেললাইনের কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে খবর পাঠালো। শহর থেকে নির্বাসিত হবার দুদিন আগে বাবা এলেন দেখা করতে। বিশ্রামের ভঙ্গীতে বসলেন তিনি, আমার দিকে তাকালেনও না, রক্তাভ মুখখানা মুছে নিয়ে পকেট থেকে বের করলেন আমাদের শহরের "দূত" পত্রিকা, এবং একটা সংবাদের প্রত্যেকটা শব্দই ইচ্ছে ক'রে জোর দিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলেন: ষ্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ছেলে, আমার সমবয়সী যুবক,—সে এক্স-চেকার অফিসের এক ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়েছে।

"আর তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো একবার"—পত্রিকাটা ভাঁজ ক'রে তিনি বললেন -"ভিক্ষাজীবী, ছেঁড়াপোষাকপরা একটা অপদার্থ জীব! এমনকি শ্রমিক ও কিষাণেরাও শিক্ষা নেয় মানুষ হবার জন্যে, আর তুমি? একজন পলোজনেভ্—পূর্বপুরুষেরা যার উচ্চ-বংশীয়, সর্বত্র যারা সম্মানিত—তার আদর্শ কি না কুলীগিরি!... হ্যাঁ, তোমার সংগে কথা বলতেও ঘৃণা হয়, আসিওনি সে জন্যে—তোমার সংগে সব সম্পর্কই ছিন্ন ক'রে ফেলেছি।"—এবার দাঁড়িয়ে উঠে ক্রুদ্ধবিকৃত কণ্ঠে বললেন—"তোমার বোনকেই খুঁজতে এসেছি আমি। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী থেকে চ'লে এসেছে, আর এখন প্রায় আটটা, অথচ ফিরবার নাম নেই। সময় নেই, অসময় নেই, বেরোতে পারলেই হয়,—আমাকে বলাও এখন আর দরকার মনে করে না, কর্তব্য কাজে তার এখন আর আগের মতো উৎসাহ নেই। এ

সবই তোমার কীর্তি,—তোমার কলুষিত প্রভাব! সেটা গেল কোথায়?”

হয়তো সেই বহুপরিচিত ছাতাটা! আমিও হঠাৎ স্কুলের ছেলের মতোই সোজা দাঁড়িয়ে পড়লাম,—বাবা হয়তো এখুনি পেটাতে স্বরু করবেন! তবে তিনিও বোধহয় ছাতাটার দিকে আমার একাগ্র দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, তাই সামলে গেলেন।

“থাকো যেমন খুশি!”—তিনি বললেন—“আমার কণামাত্র আশীর্বাদও তোমার জন্যে নয়।”

“হা ভগবান!”—দোরের পিছনে আমার ধাইমা'র দীর্ঘশ্বাস—“হায়রে হতভাগা ছেলে। ওঃ, বুকের মধ্যটা কাঁপছে। কী অমঙ্গল, কী অমঙ্গল!”

রেললাইনে কাজ করছি আমি। সমস্ত আগষ্ট ধ'রেই বৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্রাম। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে চারদিক, মাঠের শস্য ঘরে ওঠেনি এখনও। বড় বড় গোলাবাড়ীতে স্তূপীকৃত হয়ে আছে কলে-কাটা গম, আঁটি বাঁধাও নেই। শস্যগুলি দিনের পর দিন প'চে যাচ্ছে, অঙ্কুর গজাচ্ছে বীজে! কাজ করা কঠিন, সমস্ত কাজই ভেসে গেল মুষলধারা বৃষ্টিতে। রেলওয়ের দালানঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হ'ল না, আমরা এসে আশ্রয় নিলাম ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘরে, এইখানেই ভিখারীগুলো ছিল গ্রীষ্মকালে। রাতে ঘুমুতে পারি না, ভয়ানক ঠাণ্ডা; কাঠের পোকাগুলি সুড়সুড় ক'রে ঘুরে বেড়ায় হাতে মুখে। পুলের কাছে কাজ করার সময় ঐ ভিখারী গুণ্ডাগুলো দল বেঁধে আসতো, চিত্রকরদের আচ্ছা ক'রে পেটাতো,—এটা তাদের একরকমের মজার খেলা! আমাদেরও পেটাতো তারা, কেড়ে নিত ব্রাশ। আমাদের রাগাবার জন্যে ও মারামারি বাধাবার জন্যে আমাদের কাজ তারা নষ্ট ক'রে

দিত,—রঙের বালতি কেড়ে নিয়ে রঙ ঢেলে দিত সিগ্‌ন্যাল-ম্যানের গায়ে। আমাদের দুর্দশার ভরা এবার পূর্ণ হ'ল,—বাদিশ আমাদের নিয়মিত মাইনে দেওয়া বন্ধ ক'রে দিল। সমস্ত লাইনের রঙকরা কাজ ছেড়ে দেওয়া হ'ল কন্‌ট্রাক্টরদের হাতে, সে দিত আর একজনকে এবং সেও আবার শতকরা বিশ ভাগ লাভ কেটে রেখে দিত বাদিশকে। একে তো এসব কাজ তেমন লাভজনক নয়, তার উপর বর্ষার যা দশা কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। হাতে কাজ নেই কোনো, অথচ বাদিশকে রোজকার মাইনে জোগাতেই হবে। এদিকে ক্ষুধিত রঙদারেরা তাকে তো মারতেই আসে আর কি! তাকে তারা গালাগাল দেয় রক্তচোষা, ঠক, শয়তান ব'লে। আর হতভাগা বাদিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে,—অসহায়ভাবে হাত দুটি উপরে তোলে বারবার এবং টাকার জন্য বারবার ছুটতে থাকে মাদাম শেপ্রাকভের দোরে।

(সাত)

সুরু হ'ল শরত,—বৃষ্টিভেজা, কাদাভরা আঁধার-ঘেরা শরত। রাশিয়ার শরত। সুরু হ'ল বেকার দিন, একটানা শুধু ঘরে ব'সে থাকা, কখনো বা ছোট-খাট বাজে কাজ করি, চিত্রকরের কাজ নয়। মাঠ চ'ষে দিন রোজগার করি চার পেন্স। ডাঃ ব্লাগোভো গেছে পিটার্সবার্গে আমার বোনও এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছে। বাদিশ তার ঘরে শয্যাশায়ী—দিনদিন এগোচ্ছে মরণের মুখে।

আমার মনেও ঘনিয়ে এসেছে শরতের বিষণ্ণতা। শ্রমিক হয়েছি ব'লেই বোধহয় শহরজীবনটা দেখতাম কালো ক'রে। দুর্ভাগ্যের কথা, প্রায় রোজই মনে পড়তে লাগলো—অপ্রীতিকর অনেক কিছু, মনটা

ভ'রে উঠতে লাগলো গভীর হতাশায়। আমার শহুরে-বন্ধুরা—যাদের ভেতরকার কথা কিছুই জানতাম না, বা যাদের মনে হ'ত বিশেষ ভদ্র—তারাই আজ হয়ে দাঁড়ালো নিষ্ঠুর ও জঘন্য ; তারা না করতে পারে এমন কোনো কাজই নেই দুনিয়ায়। আমরা ও সাধারণ লোকেরা লুণ্ঠিত ও প্রতারিত হয়ে চলি, অকারণে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দরজায় বা রান্নাঘরে,—অসহ্যরকম অভদ্র ব্যবহার করা হয় আমাদের সংগে।

শীতকালে আমি ক্লাববাড়ী ও পড়ার ঘর তৈরী করলাম। প্রত্যেক কাজ বাবদ আমাকে দেওয়া হ'ত এক পেনি তিন ফার্দিং, কিন্তু রসিদ বইতে দুই পেন্স আধ পেনি পাই ব'লে আমাকে সই করতে হবে। এতে গররাজি হ'লে সোনার চশমাপরা বিশিষ্ট চেহারার এক ভদ্রলোক, (সমিতির মেম্বারই হবেন নিশ্চয় !) এসে চোখ রাঙিয়ে বললেন,—"আর একটা কথাও শুনছি কি, তোমার মাথাই গুঁড়িয়ে একেবারে পাউডার ক'রে দেবো। শয়তান !"

কিন্তু তারপরে তার কোনো সাকরেৎ যখন চুপি চুপি তাকে জানিয়ে দিত যে আমি হচ্ছি শিল্পী পলোজনভেরই ছেলে,—ভদ্রলোক তখন হতভম্ব হয়ে পড়তেন, লাল হয়ে উঠতেন এবং সংগে সংগেই সামলে নিয়ে বলতেন,—"যাক, গোল্লায় যাক্, আমার কি!"

দোকানে খেতে এলে আমাদের শ্রমিকদের দেওয়া হ'ত চিমসে পোড়া মাংস, জলঢালা ঝোল, শুকিয়ে-রাখা ছাকা-চা ! পুলিশেরা আমাদের গির্জা থেকে তাড়া লাগাতো, হাঁসপাতালের নার্স ও ডাক্তারেরা লুটে নিত আমাদের টাকা পয়সা। ঘুষ না দিলে তারা আক্রোশ মেটাতো পচা নোংরা খাবার দিয়ে। পোষ্ট অফিসের ক্ষুদে বাবুদেরও ধারণা,—তারা যেমন খুশি আমাদের সংগে ব্যবহার করতে

পারে। তারা অভদ্রভাবে খেঁকিয়ে ওঠে—“দাঁড়া ব্যাটা ছোটোলোক! ঠেলে ঠেলে ঢুকছো কোন চুলোয়?—গুঁতোবার জায়গা নয় এটা।” বাড়ীর কুকুরগুলো পর্যন্ত আমাদের দেখে শত্রুর মতো, দেখলেই আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোথাও নেই কণামাত্র সততা বা সংনীতি। এসব দেখে মনে এমন ঘা লাগে! কিষাণদের ভাষায় বলা যায়,—“ভগবানকে ভুলে গেছে সবাই।” চুরি জুয়োচুরি চলে প্রতিদিনই। তেলওয়ালারা, কণ্ট্রাক্টরেরা, আমাদের কর্মকর্তারা সবাই রাহাজানি চালায় আমাদের উপর। আমাদের অধিকার ব'লে যে কোনো কথা থাকতে পারে তার উল্লেখ করাও বাহুল্য, আমাদের উপার্জিত মজুরী পাবার জন্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবুদের পেছন-দোরে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছি, যেন ভিক্ষার জন্যেই হাত পেতেছি আমরা।

পড়ার ঘরের পাশের ঘরটায় কার্পেট-কাগজ লাগাচ্ছিলাম; সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরবো এমন সময় এঞ্জিনীয়ার ডলঝিকভের মেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল আমারই ঘরে,—বগলে এক বাণ্ডিল বই।

মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালাম।

“নমস্কার, কেমন আছেন আপনি!”—আমাকে চিনতে পেরে সে হাতখানা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো—“সত্যি, আপনাকে দেখে এতো খুশি হয়েছি।”

বিস্মিত উৎসুক দৃষ্টি মেলে সে দেখতে লাগলো: আমার কোর্তাটা, রঙের পাত্রটা, মেঝেতে ছড়ানো কাগজগুলো। আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম, তারও কেমন লাগছিল!

“আপনাকে এই অবস্থায়ই দেখতে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।” সে বললো—“আপনার অনেক কথাই শুনেছি, বিশেষ ক'রে ডাঃ ব্লাগোভোর মুখে। তিনি তো আপনার প্রেমেই প'ড়ে গেছেন।

আপনার বোনের সংগেও আলাপ হয়েছে, এমন শান্ত মেয়েটি! কিন্তু, কিছুতেই আমি তাকে বোঝাতে পারলুম না যে আপনার এই সহজ জীবনধারা গ্রহণ করার মধ্যে অন্যায় তো কিছুই নেই, বরং আপনি এই সমস্ত শহরেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।”

সে রঙের পাত্র ও কার্পেট-কাগজের দিকে তাকাতে তাকাতে আবার বলতে লাগলো—

ডাক্তার ব্লাগোভাকে বলছিলাম, আপনার সংগে একটু ভালোভাবে আলাপ করিয়ে দিতে কিন্তু সম্ভবত তিনি ভুলেই গেছেন অথবা সময় পাননি। যাই হোক, আজ তো পরিচিত হয়ে গেলাম। আপনি যদি মাঝেমাঝে দয়া ক'রে আমাদের ওখানে একটু আসেন তো আপনার কাছে ঋণী থাকবো আমি। একটুখানি কথা বলবার মতো লোক কতো খুঁজি। দেখুন, আপনি সত্যি বেশ সহজ মানুষ।”—আমার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলতে লাগলো—“আশা করি, আমার কাছে কোনোরকম দ্বিধা বা অযথা ভদ্রতা করবেন না। বাবা এখানে নেই,—পিটার্সবার্গে গেছেন।”

পড়ার ঘরে এলো সে পোষাকের খস্‌খস্‌ শব্দ করতে করতে। আমিও বাড়ী ফিরলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না চোখে।

এই বিষণ্ণ শরতের দিনে কে এক দরদী মানুষ আমার জীবনটাকে একটু তাজা ক'রে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেয় নেবু বিস্কুট অথবা রোষ্টকরা পাখী! কার্পোভনার মুখে শুনলাম ফি-বারেই এসব নিয়ে আসে একজন সৈনিক, কোত্থেকে যে আনে কে জানে! সৈনিকটি এসে খোঁজ-খবরও নেয়ঃ আমার স্বাস্থ্যের কথা, খাওয়া-দাওয়ায় কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা, আমার গরম জামা-কাপড় আছে কিনা ইত্যাদি। তুষার পড়া সুরু হ'লে একদিন আমার অনুপস্থিতকালে

ঠিক আগের মতোই একজন সৈনিকের মারফত উপহার এল--নরমহাতে বোনা একটা স্কার্ফ, ক্ষীণ একটা মদির গন্ধ জড়ানো তা'তে! আমিও বুঝতে পারলাম কে আমার সেই দরদী নারী! স্কার্ফে "লিলি-অব-দি-ভ্যালি"-র গন্ধ,—অনীতার প্রিয় ফুল!

শীতের দিকেই বেশী কাজ পড়তো, ভালই লাগতো। রাদিশ সেরে উঠলে দুজনে মিলে কাজ সুরু করলাম কবরসংলগ্ন গির্জায়। এ-কাজে ঝামেলা নেই, লোকে বলে লাভও আছে বেশ। একদিনেই অনেকটা কাজ শেষ হয়,—সময় চ'লে যায় দেখতে না দেখতে। কোনোরকম গালিগালাজ, হাসি ঠাট্টা, বা হৈ-হল্লা নেই। জায়গাটিই এমন যে এখানে সব চঞ্চলতাই শান্ত হয়ে আসে, নম্র হয়ে আসে। মনের ভাবনা পর্যন্ত হয়ে ওঠে নীরব-গম্ভীর। দাঁড়িয়ে বা ব'সে কাজ করি। চারদিকের স্তব্ধতা মৃত্যুর মতো গম্ভীর—কবরভূমির আবহাওয়া। কাজ করার সময় হাত থেকে যদি কোনো যন্ত্রপাতি মাটিতে প'ড়ে যেত হঠাৎ, বা প্রদীপের শিখাটা পত্‌পত্‌ ক'রে উঠতো,—তবে তার শব্দে আমরা চমকে উঠতাম, চারদিকে তাকাতে থাকতাম। দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে থেকে শোনা যেত মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ! কে না যে বারান্দায় ব'সে শোকের গান গাইছে চাপা স্বরে। অথবা কোনো চিত্রকরই রঙ্‌ লাগাতে লাগাতে শিস দিতেই হঠাৎ থেমে পড়ছে। কখনো বা রাদিশই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে থাকে আপন প্রশ্নের উত্তরে—"ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব।" কখনো বা মাথার উপরে বেজে ওঠে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি,—নিশ্চয়ই কোনো বড়লোকের সৎকার হচ্ছে···

গির্জার এই প্রদোষ আলোয় দিনগুলি কেটে যায়;—দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলিতে বিলিয়ার্ড খেলি বা নতুন ট্রাউজারটা প'রে থিয়েটারের গ্যালারীতে বসি গিয়ে। আস্কোগিনের ওখানে কনসার্ট অভিনয়

সুরু হয়ে গেছে। আজকাল চিত্রপট আঁকে রাদিশ একাই। সে ফিরে এসে নাটকের গল্পটা বলতো আমাকে, ঈর্ষাভরা আগ্রহে আমি শুনতে থাকতাম। রিহাসেলে যাবার সাধ ছিল খুবই, কিন্তু আঝোগিনের ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খৃষ্টমাস পর্বের আগে ডাঃ ব্লাগোভো এল। আবার সুরু হ'ল আমাদের আলোচনা, সন্ধ্যায় বিলিয়ার্ড খেলা। খেলার সময়ে সে কোট রেখে সার্টের বুকটা খুলে রাখতো এবং কোনও কারণে মরীয়া গোছের একটা ভাব ক'রে থাকতো। বেশী মদ খেত না সে, কিন্তু মদের কথায় হৈ-হল্লা করতো খুবই। তার একটি বিশেষ দক্ষতা ছিল। একসন্ধ্যায়ই সে 'ভল্‌গা'র মতো সস্তা সরাইখানায়ও খরচ ক'রে আসতো পুরো বিশ রুবল।

আমার বোনও আবার আমার সংগে দেখা সুরু ক'রে দিল। প্রত্যেকবারেই আমার বোন ও ডাক্তার দুজনে দুজনকে দেখতে পেয়েই বিস্ময়ের ভাব দেখাতো। কিন্তু বোনের প্রফুল্লভাব থেকেই ধরা প'ড়ে যেত যে এই দেখা হওয়াটা মোটেই আকস্মিক নয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিলিয়ার্ড খেলছিলাম। ডাক্তার বলছিল আমাকে—"আচ্ছা, মিস্ মেরিয়া ডলঝিকভের সাথে দেখা করতে যাও না কেন তুমি, মেরিয়াকে জানো না তুমি। চমৎকার মেয়ে সে, মুগ্ধ হবার মতোই। এমন সরল, এমন ভালোমানুষ!"

তার বাবাই গতবার বসন্তকালে কীভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল সেকথা বললাম।

"কী যে বকছো।"—ডাক্তার হেসে উঠলো—"এঞ্জিনীয়ার ও তার মেয়ে একেবারেই আলাদা। সত্যি বলছি বন্ধু, তার সংগে অভদ্র ব্যবহার কোরো না, মাঝে মাঝে যেও, দেখা কোরো গিয়ে। আচ্ছা, কালই চলো না যাই, কি বলো?"

আমাকে সে রাজি করালো। পরদিন সন্ধ্যেবেলা নতুন ট্রাউজারটা প'রে একটু ব্যস্তসমস্ত হয়েই চললাম ডলঝিকভদের বাড়ীতে। অনুগ্রহ-প্রার্থী হয়ে যেদিন এসেছিলাম সেদিন আর আজ! সেই দারোয়ানকেই মনে হ'ল না ততটা ভয়ানক, আসবাবপত্রও যেন ততটা আড়ম্বরময় নয়। মোরিয়া ভিক্টরভনা আমাদের প্রতীক্ষা করছিল: পুরোনো বন্ধুর মতোই সে আমাকে হাত ধ'রে ডেকে নিল। ধূসর রঙের একটা লম্বা পোষাক পরণে তার, কেশবিন্যাস করেছে কান ঢেকে। বছরখানেক হ'ল শহরে এই নতুন ফ্যাসান এসেছে। এতে তার মুখখানা দেখাচ্ছিল আরও চ্যাপ্টা, তার বাবার মুখের মতোই। তার মুখে কী যেন একটা আছে,—স্লেজচালকের মুখের মতোই। সুন্দরী ও মার্জিতা হ'লেও তাকে তরুণী বলা চলে না। ত্রিশের মতো দেখালেও সত্যিকার বয়স তার পঁচিশের বেশী নয়।

"ডাক্তারবাবু, সত্যি আপনার কাছে ঋণী আমি। আপনি না হ'লে উনি কখনোই আমার সংগে দেখা করতে আসতেন না আর। এখানে দিনদিন আমি যেন ম'রে যাচ্ছি। বাবা চ'লে গেছেন, বাড়ীতে আমি একা। এত বড় শহরটায় একা আমি, কী যে করি! মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে।"

সে জানতে চাইলো কোথায় কাজ করছি আমি, আর করি কত, থাকি কোথায়?

"আপনার নিজের আয়ের অতিরিক্ত কিছুই কি ব্যয় করেন না আপনি?"—সে জানতে চাইলো।

"না।"

"আপনিই সুখী!"—দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে— "জীবনের যত বিকৃতি ও অপরাধ সবই আসে আলস্য থেকে,—একঘেয়েমি ও মানসিক

অন্তঃসারশূন্যতা থেকে। কাউকে যদি অন্যের ঘাড়ের উপরে বাঁচতে হয় তো এসব হবেই। ভাববেন না, আমি ভদ্রতা করছি, সত্যিই বলছি আমি, ধনী হওয়া সুখেরও নয়, মজারও নয়। "কারণ, সাধু লোক কোনোদিন ধনকুবের হয়নি, হ'তেও পারে না।"

সে তাদের আসবাবপত্রের উপরে তীক্ষ্ণ একটা বিতৃষ্ণা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো ঃ

"সুখ ও বিলাসের একটা মোহিনী শক্তি আছে, ধীরে ধীরে তা গ্রাস ক'রে নেয় নিজের খাবার মধ্যে, এমনকি যাদের খুব মনের জোর আছে তাদেরও। একসময় বাবা ও আমি থাকতাম সহজ ভাবেই,—বড়লোকের ষ্টাইলে মোটেই নয়। আর আজ? সত্যিই সাংঘাতিক, কী জঘন্য আজ সব?"—ঘাড় কোঁচকালো সে—"ফি-বছরে ব্যয় হয় আমাদের বিশ হাজার এবং তা'ও এই পাড়াগাঁয়ে!"

"আরাম ও বিলাস হচ্ছে অর্থ ও বিত্তার পোষ্যপুত্র।" আমি বললাম—"আমার মনে হয়, জীবনের আনন্দ যে-কোনোরকম শ্রমের সংগেই জড়িয়ে থাকতে পারে,—এমনকি দীর্ঘতম ও কঠোরতম শ্রমে পর্যন্ত। আপনার বাবা ধনী, কিন্তু তিনিও তো স্বীকার করেন যে তাঁকেও মিস্ত্রী ও অয়েলার হ'তে হয়েছে একদিন।"

হেসে হেসে সে মাথা নাড়ছিল সন্দেহের ভঙ্গীতে—"আমার বাবা মাঝে মাঝে সস্তা রুটি খা'ন ঝোলে ভিজিয়ে, সত্যি কথা; কিন্তু সে হচ্ছে তাঁর খেয়াল মাত্র! মানে, সেও একটা ফ্যাসান বা বিলাস।"

ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং সেও উঠে দাঁড়ালো—"ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও অন্য সবরাই মতোই শ্রম করতে হবে। সুখ বা আরামের অধিকার সবারই সমান। বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধে থাকা উচিত নয় কারও। কিন্তু আর থাক, অনেক আলোচনা হ'ল।

মজার কিছু বলুন না এবার? চিত্রকরদের কথাই বলুন না, কিরকম তারা? বেশ মজার, না?”

ডাক্তার এল ভেতরে। চিত্রকরদের কথা বলতে লাগলাম, কিন্তু কথা বলতে অনভ্যস্ত ব'লে বাধো বাধো ঠেকছিল,—বর্ণনা করছিলাম ঠিক যেন নীরস বৈজ্ঞানিকের মতো, গম্ভীর একঘেয়ে সুরে। ডাক্তারও শ্রমিকদের দু-একটা কাহিনী বললো। বলতে গিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে, চোখের জল ফেলে, হাঁটু গেড়ে ব'সে বেশ জমিয়েই নিচ্ছিলো। এমনকি একটা মাতালকে নকল করতে গিয়ে সে মেজেতে সটান শুয়ে পড়লো পর্যন্ত! ঠিক যেন একটা নাটক অভিনয়! মেরিয়া ভিক্টরভনা তো দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে চীৎকার ক'রেই ওঠে! তারপরে, ডাক্তার বাজালো পিয়ানো, গান গাইলো ক্ষীণ মিঠে সুরে। মেরিয়া তার পাশে ব'সে গান বেছে দিচ্ছিলো এবং ভুল হ'লে শুধরেও দিচ্ছিলো।

“আপনি গানও করেন শুনেছি?”—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“গানও করেন মানে!”—ডাক্তার যেন আঁৎকে উঠলো—“চমৎকার গা'ন উনি। যাকে বলে নিঁখুত শিল্পী। আর, তুমি বলছো গানও করেন! কি যে বলো!”

“একসময় গভীর আগ্রহ নিয়েই পড়াশুনো সুরু করেছিলাম”—আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে লাগলো—“কিন্তু আজকাল ছেড়ে দিয়েছি ওসব।”

নীচু একটা বেঞ্চিতে ব'সে সে বর্ণনা করলো তার পিটার্সবার্গ জীবন এবং নামজাদা কয়েকজন গায়ককে ভেঙচি কাটলো পর্যন্ত,—তাঁদের স্বর ও সুরভঙ্গী নকল ক'রে ক'রে। তার এলবামে আমার ও ডাক্তারের ছবিও এঁকেছে সে। খুব ভালোকিছু আঁকেনি সে

কিন্তু ছবি দুটো হয়েছে ঠিক আমাদেরই মতো। হাসিখুশি মেয়ে সে, কেমন সুন্দর লাগে তার বিচিত্র মুখভঙ্গী এবং এসবেই তাকে মানায় সবচেয়ে চমৎকার। ধনকুবেরের সাধু না হওয়ার কথা এমন সুন্দর শোনায় না তার মুখে। আমার ধারণা হ'ল ;—এই কিছুক্ষণ আগেও সে অর্থ ও বিলাসের কথা আন্তরিকভাবে বলছিল, না, কারও কথা নকলই করছিল মাত্র! একজন নিখুঁত ব্যংগ-অভিনেত্রী সে। মনে মনে তাকে আমি আমাদের তরুণীদের সংগে তুলনা ক'রে দেখছিলাম,—এমনকি সংযত সুন্দর অনীতা ব্লাগোভাও তার পাশে দাঁড়াতে পারে না। পার্থক্য অনেক, সযত্নলালিত একটী গোলাপের সংগে বুনো কেয়ার পার্থক্য।

খাওয়া-দাওয়া করলাম তিনজন মিলে। ডাক্তার ও মেরিয়া ভিক্টরভনা খেল লাল মদ ও শ্যাম্পেন; শুভকামনা জানিয়ে তারা পান করতে লাগলো প্রগতি, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির উদ্দেশে। মাতাল হ'ল না তারা, একটু মাতলামি করলো শুধু,—হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত চীৎকারই সুরু ক'রে দিল! শুধু ব'সে থাকবো তাই আমিও হাল্কা মদ খেলাম কিছুটা।

"প্রতিভাবান গুণী লোকেরাই জানে"—মিস ডলঝিকভ্ বলতে লাগলো—"কি ক'রে বাঁচতে হয়, চলতে হয় নিজের পথে। আমার মতো যারা মাঝামাঝির দল তারা জানে না কিছুই, পারেও না কিছুই। তাদের একমাত্র পথ হ'ল বড় কোনো সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে গা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলা।"

"কিন্তু যা নেই তাতে আবার গা ছেড়ে দেবে কি ক'রে?—ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

"দেখি না ব'লেই ভাবি যে নেই।"

"তাই কি? সামাজিক আন্দোলন হ'ল এই নতুন সাহিত্যযুগের দান,—তার উদ্ভাবন। আমাদের মধ্যে আসলে অমন কিছুই নেই।"

আরম্ভ হ'ল যুক্তিতর্ক।

"আমাদের মধ্যে গভীর কোনো সামাজিক আন্দোলনের অস্তিত্বই নেই, হয়ও নি কোনোদিন।"—ডাক্তার জোর গলায় জাহির করে—"নতুন সাহিত্যের সৃজনী-শক্তির অন্ত নেই। দেশে তা সৃষ্টি করেছে বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের দল। তবে আমাদের গাঁ খুঁজলে দেখবে একটা কৃষক তিনটে অক্ষরের শব্দ বানান করতে গিয়ে ভুল করবে চারটে! আসল কথা, আমাদের সংস্কৃতি-জীবন আরম্ভ হয়নি এখনও,—এখনও রয়েছে সেই বর্বরতা, একটানা অসভ্যতা, সেই হীনতা, নীচতা,—ঠিক পঁচিশ বছর আগেও ছিল যেমন। আন্দোলন ও আলোচনা হয়েছে যথেষ্টই কিন্তু সে সমস্তই হীন অর্থলোভে জড়ানো,—তার মধ্যে চেয়ে দেখবার মতো কিছুই নেই। এই ধরুন, আপনি যদি একটা গভীর আন্দোলনে নামেন, আধুনিক রুচি মাফিক কোনো দায়িত্বভার হাতে নিয়ে থাকেন, যেমন পাখী পোকাদের বন্ধনমুক্তি বা গোমাংস ভক্ষণের নিষেধ ব্যবস্থা,—তবে আগে থাকতেই আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। দেখুন, আমাদের দরকার পড়া আর পড়া,—ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। গভীর সামাজিক আন্দোলনের জন্য এখনো প্রতীক্ষা করতে হবে, এখনো আমরা তার উপযুক্ত হইনি,—সত্যি কথা, আমরা তার কিছুই জানি না পর্যন্ত!"

"আপনি না জানতে পারেন কিন্তু আমি জানি।"—মেরিয়া ভিক্টরভ্না ব'লে উঠলো—"আপনার কথা আজ বড় একঘেয়ে ঠেকছে।"

"আমাদের একমাত্র কর্তব্য হ'ল পড়া আর পড়া, যতদূর সম্ভব জ্ঞানার্জন করা, আমাদের ভবিষ্যত শান্তি নির্ভর করছে একমাত্র জ্ঞানের উপর। বিজ্ঞান কি জিন্দাবাদ!"

"একটা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, নতুন কোনোভাবে আমাদের জীবন গঠন করা দরকার।" –মেরিয়া ভিক্টরভ্না কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো। "এতদিন চ'লে এসেছে যে জীবন তার কোনো অর্থই হয় না। আচ্ছা থাক, এ আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই।"

চ'লে আসার সময় গির্জা ঘণ্টার দু'টো বাজলো।

"মেয়েটিকে ভালো লাগলো?"—ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো—"বেশ চমৎকার, না?"

খৃষ্টমাস পরের দিন মেরিয়া ভিক্টরভ্নার সংগে একত্র খাওয়া-দাওয়া করতাম আমরা, এবং সমস্ত ছুটিটার প্রত্যেক দিনই তার সংগে দেখা করতে যেতাম। আমরা ছাড়া সেখানে আর কেউই থাকতো না। সে ঠিকই বলেছে, আমি আর ডাক্তার ছাড়া সমস্ত শহরে তাকে দেখবার আর কেউই নেই। দিনের প্রায় সময়টাই আলাপে আলোচনায় কাটতো বেশ। ডাক্তার মাঝেমাঝে কোনো বই বা পত্রিকা নিয়ে আসতো ও উচ্চকণ্ঠে প'ড়ে শোনাতো। আমার জীবনে তাকেই প্রথম শিক্ষিত লোক দেখলাম। অনেক কিছু তার জানাশোনা আছে কিনা জানি না, তবে জ্ঞান সে এমনভাবে পরিবেষন করে যে অন্য সবাইও সমানে তা উপভোগ করতে পারে। ওষুধের কথা সে বলতো এমন নতুন দৃষ্টিতে যে আমার মনে তার সুন্দর একটি ছাপ লেগে থাকতো। শহরের যে কোনো ডাক্তার থেকে সে ছিল আলাদা। আমার মনে হ'ত ইচ্ছে করলেই সে একজন বৈজ্ঞানিক হ'তে পারে। সেই সময় একমাত্র সেই বোধহয় আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাকে দেখে, তার দেওয়া বই প'ড়ে প'ড়ে আমিও জ্ঞানের জন্য তৃষিত হয়ে উঠলাম, আমার নিরানন্দ শ্রমজীবনে খুঁজে পেলাম পরম সার্থকতা। সত্যিই

কি আশ্চর্য, তখন পর্যন্ত জানতাম না আমি,—পৃথিবীটা কি উপাদানে গঠিত। জানতাম না আমাদের নিত্য ব্যবহার্য তেল, রঙ কি পদার্থ। অথচ না জেনেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। ডাক্তারের সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে অনেক দিক থেকেও উন্নত হয়েছি। সব সময়েই আমি তর্ক করতাম তার সঙ্গে। এবং সব সময়েই আমি নিজের মতবাদ আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু তবুও দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার সমস্ত মতামত স্পষ্ট ও বিশ্বাস্য নয়। নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কতকগুলি মতবাদ খাড়া করতে যে নানা চেষ্টা করতাম আমার বিবেকের নির্দেশ যাতে স্থির অচঞ্চল থাকে, মনের মধ্যে কিছুই ঘোলাটে না থাকে। শহরের মধ্যে সবচেয়ে সংস্কৃত ও শিক্ষিত লোক হলেও সে মোটেই নির্দোষ মানুষ বা আদর্শ মানুষ ছিল না। তার চালচলনে, কথাবার্তায়, যুক্তিতর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার বাহাদুরীতে, তার মিষ্টি গলায়, এমন কি তার বন্ধুত্বে পর্যন্ত অমার্জিত কিছু একটা ছিল—অনেকটা গির্জার ছাদের মতোই। এবং সে যখন একটু বেশি নিম্ন-নাটের বুকটা খুলে বসতো বা রেস্তোরায় ভৃত্যদের বকশিশ ছুঁড়ে দিত তখন একটা কথা আমার মনে হ'ত বারবার, সংস্কৃতি খুব ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে এখনো মাথা চাড়া দিয়ে আছে আদিম তাতার।

সকালে ডাক্তার গেল পিটার্সবার্গে, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমার বোন এসে হাজির। কোট ও টুপি না খুলেই নীরবে সে ব'সে পড়লো। মুখখানি মলিন,—নিস্পন্দ চোখদুটি মাটির উপরে নিবদ্ধ, তুষারে হিমার্ত দেহ।

"নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে তোমার।"— বলছিলাম।

তার দু'চোখে অশ্রু ভ'রে উঠলো। আমাকে একটা কথাও না ব'লে সে কার্পোভ্নার কাছে চ'লে গেল,—আমি যেন কোথাও তাকে

আঘাত দিয়েছি। একটু পরে শুনতে পেলাম সে ধাত্রীর কাছে অনুশোচনার সুরে কেঁদে কেঁদে বলছে :

"ধাই মা, এতদিন যে বেঁচে ছিলাম কি জন্য? কেন? আমার যৌবন আমি মাটি ক'রে দিয়েছি। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি চ'লে গেল অথচ জানলাম না কিছুই! দিনরাত শুধু হিসেব রাখা, চা পরিবেষন করা, অতিথিদের আপ্যায়ন করা এই কি সব!—তখন ভেবেছি দুনিয়ায় এই তো সব! ধাই-মা তুমি একবার বুঝে দেখো। আমিও তো মানুষ! আশা আকাঙ্ক্ষা আছে আমার বুকে,—বাঁচতে চাই আমি, কিন্তু আমাকে যে ঘরের দাসীর মতো ক'রে রেখেছে সবাই। ওঃ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!"

ভাঁড়ারের চাবি-গোছা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং সেটা ঝং ঝং ক'রে পড়লো এসে আমারই ঘরে। আমার মাও একগোছা চাবি নিয়ে বেড়াতো—আলমারি, দেরাজ, রান্নাঘর, সিন্দুক সমস্ত চাবির বড় একগোছা!

"ওঃ ভগবান!"—ভয়ে বুড়ী কেঁদে ওঠে "ওঃ ভগবান, ওঃ।"

বাড়ী ফেরার আগে বোন আমার ঘরে চাবিটা নিতে এসে বললো,—"মাফ করবে আমাকে! কিছুদিন থেকে আমার জীবনে নতুন কিছু ঘটছে!"

(আট)

সন্ধ্যার পর একদিন মেরিয়া ভিক্টরভনার কাছ থেকে বাড়ী ফিরে দেখি আমার ঘরে ব'সে আছে একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর; টেবিলে ব'সে সে আমার বইগুলো খুলে খুলে দেখছে।

আমাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"এই তৃতীয়বার! মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আপনাকে কাল তার ওখানে নটার সময় হাজির হ'তে আদেশ জারি করেছেন। মনে থাকে যেন!"

মহামহিমান্বিত গভর্ণরের আদেশানুযায়ী কাজ করবো, বিবৃতি লিখে সই ক'রে দিলে সে চ'লে গেল। রাতের বেলায় পুলিশের আগমন ও গভর্ণরের আমন্ত্রণ,—দুটো মিলে মনটা ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে রইলো। কচিবেলা থেকেই পুলিশ, পাহারাওয়ালা বা কনষ্টেব্‌ল দেখলে অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠতো, এখন নতুন এক অস্বস্তিতে মনটা খারাপ হয়ে রইলো। আমি যেন সত্যিকার অপরাধী। কিছুতেই ঘুম এল না চোখে। আমার বুড়ী ধাত্রী এবং প্রকোফিও ভীত হয়ে পড়লো, ঘুমুতে পারলো না। বুড়ীর তো মাথাই ধ'রে বসলো। সে গোঙাতে লাগলো, যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে চীৎকার করতে লাগলো। আমি জেগে আছি শুনে প্রকোফি এল একটা বাতি নিয়ে, এবং টেবিলে ব'সে একটু পরে বললো—"গরম গরম কিছুটা মৌ খেলেই সেরে যাবে এক্ষুনি। কোনোই ক্ষতি করবে না। মার কানের মধ্যেও গরম গরম মৌ ঢেলে দিলে কিছুটা সোয়াস্তি পেতো।"

দুটো থেকে তিনটের মধ্যে সে কসাইখানায় যায় মাংস আনতে। আর ঘুমানো উচিত নয় ভেবে নটা পর্যন্ত সময় কাটাতে আমিও তার সংগে বেরিয়ে পড়লাম। সংগে একটা লণ্ঠন। প্রকোফির তেরো বছরের ছেলে নিকোলকা সংগে সংগে চললো শ্লেজ গাড়ী চালিয়ে। তুষার ঘায়ে গালে তার নীল নীল দাগ, চেহারাটা ঠিক ছোট্ট একটি গুণ্ডার মতোই; ভাঙা গলায় সে শ্লেজের ঘোড়াগুলিকে তাড়া দিচ্ছিল।

"গভর্ণর আপনাকে শাস্তি দেবে মনে হয়।"—প্রকোফি বললো—"প্রত্যেকেরই একটা নিয়মকানুন আছে,—গভর্ণরের, বিশপের, ডাক্তারের,

প্রত্যেকেরই। কিন্তু আপনার নিয়ম আপনি ঠিক রাখেন নি,—আপনাকে তো ঠেকতে হবেই।”

কবরভূমির পাশেই কসাইখানা, জায়গাটা এতদিন পর্যন্ত দূর থেকেই দেখেছি শুধু। তিনটা কদর্য ঠেলা-গাড়ী, চারপাশে ভাঙা পাঁচিল। গ্রীষ্মকালে এদিক দিয়ে যখন হাওয়া বয় কী বিশ্রী দুর্গন্ধের ঝাপটা আসতে থাকে! অন্ধকারে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না,—কেবল ঘোড়া ও শ্লেজ গাড়ী। কতকগুলি গাড়ী শূন্য, কতকগুলি মাংস বোঝাই। লণ্ঠন নিয়ে প্রেতের মতো ফিরছে অনেক লোক, আর ভগবানের নামে গালাগাল দিচ্ছে জঘন্য ভাষায়। প্রকোফি ও নিকোলকাও শপথ করছিল অশ্রাব্য উক্তিতে। চারদিকেই কেবল গালিগালাজ, যাচ্ছেতা শপথ, কাশি আর ঘোড়ার ডাক, মড়ার আব গোবরের গন্ধ। তুষাব গ'লে গ'লে চাবদিকটা হয়েছে কাদার নরককুণ্ড। অন্ধকারে মনে হচ্ছিলো যেন রক্তসমুদ্রের মধ্য দিয়েই হাঁটছি!

গাড়ীতে মাংস বোঝাই ক'রে বাজারে চললাম আমরা,—কসাইয়ের দোকানে। তখন আলো ফুটতে সুরু হয়েছে। ঝুড়ি হাতে পাচিকারা আসছিল একে একে; প্রকোফির হাতে ভোজালি, তার শাদা পোষাকটা রক্তের দাগে ভিজা। ভগবানের নাম তুলে সে যাচ্ছেতাই শপথ করছিল বারবার, তবে গির্জার কাছে আসতেই কিন্তু প্রণাম করলো একবার এবং তারপরেই সমস্ত বাজার জাগিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফিরি করতে লাগলো,—মাংস, মাংস! খুব সস্তা!—এমনকি আজ কিছুটা ক্ষতিই সহ্য করছি। আসলে কিন্তু সে ওজনে আর ভাঙানিতেই সুদ তুলে নিচ্ছিল,—সবাইকে সে ঠকাচ্ছিল দুদিক থেকেই। ক্রেতারাও দেখছিল তা, কিন্তু তার চীৎকারের চোটে কিছু বলবার জো আছে? তারা যাবার বেলায় বলছিল শুধু—“ব্যাটা জল্লাদ!”

প্রকোফি তার সাংঘাতিক ভোঁজালিটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে এমন ভয়ংকর ভঙ্গী করে, এমনভাবে মুখবিকৃত ক'রে রাখে যে ভয় হয়, এই কারো মাথায় বা হাতের উপরেই ঘা লাগে বুঝি!

সমস্ত ভোরটাই কসাইর দোকানে কাটিয়ে গভর্ণরের ওখানে গিয়ে পৌছলাম। তখন আমার গা থেকে বেরুচ্ছে মাংস ও রক্তের কটু গন্ধ! মনের অবস্থাটাও এমন উগ্র যেন বর্শা হাতে বেপরোয়া বেরিয়ে পড়েছি ভালুক শিকারে! আজো মনে আছে সেই মস্ত বড় লম্বা সিঁড়ি, তার উপরে পাতা ডোরা-কাটা কার্পেট, যুবক অফিসারদের জামায় ঝলমল করছে উজ্জল বোতাম; নিঃশব্দ আঙুলে তারা আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আমার আগমন বার্তা প্রচার ক'রে দিল। এলাম হলঘরে। ঘরটা খুব আড়ম্বরময় হ'লেও কেমন অশোভন-ভাবে সাজানো। দেয়ালের মাঝে মাঝে আঁটা ছোট-বড় আয়না; উজ্জল হলদে রঙের পর্দাগুলি চোখে লাগছিল। দেখলেই মনে হবে গভর্ণর বদলে গেছেন বটে, আসবাব রয়েছে ঠিকই। যুবক অফিসারটি হাত দিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। সবুজ একটা টেবিলের সামনে এলাম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন এক মিলিটারী অফিসার, বুকে আঁটা সম্মানসূচক পদক।

"মিঃ পলোজনেভ, আপনাকে আসতে বলেছি আমি,"—হাতে একটা চিঠি নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন মুখখানা ফুটবলের মতো গোল ক'রে—"আসতে বলেছি একটা কথা জানবার জন্য। আপনার বহুমান্য পিতা পত্র-মারফৎ এবং স্ব-মুখে গভর্ণরের কাছে আবেদন করেছেন, অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে তলব করার জন্যে এবং আপনার এই চেতনা জাগিয়ে তুলবার জন্য যে অতি উচ্চবংশের লোক হয়েও আপনি কি রকম অশোভন ও অন্যায় আচরণ ক'রে চলছেন। বহুমান্য এলেকজাণ্ডার

প্যাভলোভিচের ধারণা ঠিকই যে আপনার আচরণ একটা কুদৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছে, তিনি ঠিকই বুঝেছেন যে শুধুমাত্র তার উপদেশই যথেষ্ট নয়, আপনার জন্যে দরকার সরকারী হাতের কড়া শাসন। তিনি তাঁর অভিমত এই চিঠিতেই ব্যক্ত করেছেন। আমিও তাঁর সংগে একমত।"

কথা কয়টি ভদ্র ভঙ্গীতে সোজা দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি বললেন,—আমিই যেন তার উপরিওয়ালা, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কড়া মেজাজের লক্ষণমাত্র নেই। মুখ তার ক্লান্ত শীর্ণ রেখায়িত, চোখের নীচে কালি পড়া, তবে চুলে কলপ! চেহারা দেখে বলা শক্ত তার বয়স চল্লিশ কি ষাট্।

"আমি বিশ্বাস করি"—আবার বলতে লাগলেন তিনি—"আপনার বহুমান্য পিতা এলেক্জাণ্ডার প্যাভ্লোভিচের আন্তরিক ইচ্ছাটা আপনি বুঝতে পারছেন। তিনি আমাকে সব কথা ব্যক্তিগতভাবেই জানিয়েছেন। আমিও আপনার সংগে ব্যক্তিগতভাবেই কথা বলতে চাই। গভর্ণর হিসেবে বলছি না, বলছি আপনার বাবার সম্মানের খাতিরেই। কাজেই, আপনার আচরণ বদলে ফেলে বংশ-মর্যাদার উপযুক্ত কোনো কাজ গ্রহণ করুন,—অথবা চ'লে যান কোনো অচেনা জেলায়,—যা খুশি করুন গিয়ে! অন্যথা, চরম ব্যবস্থাই নিতে হবে আমাকে।"

কিছুকাল আমার দিকে তিনি হা ক'রে চেয়ে রইলেন—"আপনি কি নিরামিষাশী?"

"না, মাংসাশী।"

এবার ব'সে প'ড়ে তিনি কয়েকটা কাগজ টেনে নিলেন। আমি মাথা নুইয়ে চ'লে এলাম।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগে এখন আর কাজে গিয়ে লাভ নেই। বাড়ী এলাম ঘুমোতে, কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। কসাইখানার রুগ্ন একটা অস্বাস্থ্যকর গন্ধের ঝাঁঝ আর গভর্ণরের সংগে কথাবার্তার ফলে একটা অপ্রীতিতে সমস্ত মনটাই বিগড়ে রইলো। সন্ধ্যা হ'লে বিষম বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে এলাম মেরিয়া ভিক্টরভ্‌নার কাছে। তাকে বললাম সব ঘটনা, সে তো বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো খালি, যেন সে বিশ্বাস করতেই পারছে না। তারপর হঠাৎ সে হালকাভাবে হাসতে লাগলো খালি—উচ্চকণ্ঠে, দুর্দমনীয় আবেগে! অমন হাসি সন্তুষ্টচিত্ত ভালোমানুষেরাই হাসতে পারে শুধু!

"কিন্তু অমন কথা পিটার্সবার্গে কেউ যদি বলতো একবার!" —হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো সে টেবিলের উপর, এপাশে-ওপাশে দেহটিকে হেলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—"কেউ যদি একথা বলতো একবার পিটার্সবার্গে!"

(নয়)

প্রায়ই আমাদের দেখাশোনা হয় আজকাল। কখনো কখনো দিনে দুবারও। দুপুরে খেয়ে দেয়ে প্রায় দিনই আসতো সে কবরভূমিতে এবং কবরস্তম্ভের উপরকার স্মৃতিলেখা পড়তে পড়তে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকতো। কখনও বা নিজেই সে চ'লে আসতো গির্জাতে আমার পাশে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাজ করা দেখতে থাকতো। নিস্তব্ধ চারদিক, চিত্রকরেরা রঙ্ ক'রে যাচ্ছে, রাদিশ আউড়ে চলেছে সাধুসন্তদের বাণী। এখানে অন্যসব মজুরদের থেকে কোনোই তফাৎ নেই আমার, আর সবারই মতো ছোট একটা কোর্তা গায়ে দিয়ে

কাজ ক'রে যাচ্ছি,—সবাই আমাকে নাম ধ'রেই ডাকে। কিন্তু এই সবকিছুই তার কাছে লাগে নতুন—কেমন যেন ব্যথার মতো! একদিন ছাতে রঙ্ লাগাতে লাগাতে একজন চিত্রকর আমাকে নাম ধ'রে ডাক দিল তার সামনেই—"মিজেইল, শাদা রঙটা দাও তো।"

রঙটা দিলাম, মাচা থেকে নামলে পরে আমার মুখে সে চেয়ে রইলো। তার চোখে জল, মুখে হাসি!

"কী যে মানুষ তুমি!"—বলছিল সে।

ছোটবেলার একটা ঘটনা এখনো স্পষ্ট মনে আছে আমার। আমাদের শহরের এক ধনীর বাড়ীতে ছিল একটা টিয়েপাখী। একদিন সেটা খাঁচা থেকে পালিয়ে গেল। তারপর মাসখানেক ধ'রেই উড়ে উড়ে ফিরলো বন থেকে বনান্তরে,—নীড়হারা একেলা পাখী। মেরিয়াকে দেখে আমার সেই পাখীটির কথাই মনে হ'ত।

"এক কবরভূমি ছাড়া আমার তো আর যাবার জায়গাই নেই!" —হাসতে হাসতেই বললো সে—"শহরটা একেবারেই অসহ্য একঘেয়ে। আঝোগিনদের ওখানে একঘেয়ে সেই মামুলি আবৃত্তি, গান আর তোত্লামি। কিছুদিন থেকে বিরক্তি ধ'রে গেছে ওদের উপর। আপনার বোনও কিন্তু ঠিক সামাজিক নয়। কুমারী ব্লাগোভো কি জানি কেন, দেখতে পারে না আমাকে। থিয়েটারেরও তোয়াক্কা রাখিনা আর; বলুন না, এখন যাই কোথায়?"

মেরিয়ার সংগে যখন দেখা করতে যাই,—আমার পা থেকে বেরোতে থাকে রঙ্ ও তারপিনের গন্ধ, হাতে রঙের দাগ। তার কিন্তু খুবই ভালো লাগে এসব। শ্রমিকবেশেই আমি তার কাছে আস্‌বো—এই সে চায়। কিন্তু তাদের ঐ বৈঠকখানাতে আমার শ্রমিকবেশ বড় বেখাপ্পা ঠেকে, আমি কেমন বিব্রত হয়ে পড়ি।

তাই দেখা করতে গেলেই সার্জের নতুন ট্রাউজারটা বের ক'রে নেই; তার কিন্তু ভালো লাগে না।

"এই বেশে আপনাকে কিন্তু মোটেই সহজ লাগে না, একেবারেই মানায় না। আচ্ছা একটা কথা বলবো, নিজের উপরে খুশি নন আপনি, নিজের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস নেই,—তাই না? যে ধরণের জীবিকা আপনি বেছে নিয়েছেন—সেই রঙ্ করার কাজেই খুশি নন আপনি। বলুন, সত্যি খুশি?"—হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলো সে। "রঙ করা জিনিষ দেখায় ভালো, টেঁকেও বেশী। দেখুন, এগুলি হ'ল শহুরে বাবুদের চালিয়াতির কথা,—এক কথায় বিলাসের ব্যাপার। তা ছাড়া, আপনিই তো এক সময় বলেছেন যে প্রত্যেকেরই নিজের হাতে খেটে খাওয়া উচিত। কিন্তু আপনার কাজে তো আপনি খাবার পান না, পান টাকা। নিজের কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন না কেন? খাবার পেতেই চেষ্টা করা উচিত আপনার, মানে লাঙলচষা, বীজ বুনানো, ফসলকাটা, শস্য মাড়ানো, এমনি সব কাজ—কৃষিকাজের সংগেই যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তারপর গরু পালন করা, মাটিকাটা, কাঠ দিয়ে ঘর বানানো······"

পড়ার টেবিলের কাছের ছোট্ট একটা আলমারী খুলে সে বলতে লাগলো আবার······

"দেখুন, আপনার কাছে আমার সবকিছুই খুলে দেখাতে চাই। হ্যাঁ, এইটে হ'ল আমার কৃষি-গ্রন্থালয়। এখানে পাবেন মাটিতে ফাঁস লাগানোর কথা, শাকশব্জী, ফলমূলের বাগান, গোশালা, মৌচাক··· সবকিছুই। লুব্ধের মতোই আমি পড়ি এসব এবং ইতিমধ্যেই আমি সব কথা জেনে ফেলেছি। বসন্তকাল সুরু হ'লেই আমি চ'লে যাবো আমাদের দ্যুবেত্স্কিয়ায়,—সেই আমার প্রাণের সাধ, আমার জীবনের

স্বপ্ন! কী যে চমৎকার হবে সেখানে। চমৎকার, অপূর্ব! অপূর্ব নয়? প্রথম বছরে সবদিক দেখে শুনে সবাইর সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবো; পরের বছর থেকে নিজেই লেগে যাবো কাজে, একেবারে উঠে পড়ে লাগবো। বাবা আমাকে দ্যুবেত্‌স্নিয়াটা দান করবেন বলেছেন। আমার মনের মতন ক'রেই গ'ড়ে তুলবো তাকে।"

হাসিকান্নায় উজ্জ্বল হয়ে সে তার দ্যুবেত্‌স্নিয়া-জীবনের স্বপ্ন বর্ণনা করতে লাগলো। কী সুন্দর জীবন হবে সেখানে। আমার নিজেরই ঈর্ষা হচ্ছিল শুনে। সামনেই বসন্তের দীর্ঘতর দিন। বসন্তের মিঠে আমেজ আকাশে বাতাসে। আমার প্রাণও আকুল হয়ে উঠছিল গাঁয়ের জন্যে!

সে যখন দ্যুবেত্‌স্নিয়ায় চ'লে যাবার কথা বললো,—আমি স্পষ্টই বুঝলাম যে শহরে প'ড়ে থাকবো আমি একা! আমি যেন তাকে মনে-প্রাণে ঈর্ষা করতে লাগলাম। শুধু তাকে নয়, তার ঐ বই-এর আলমারী, কৃষকদের কথা,—তার সবকিছুই। চাষবাসের কিছুই জানি না আমি, ভালোও লাগে না। তাকে বলতে চাইলাম, মাঠের কাজ তো দাসের কাজ। কিন্তু তক্ষুনি মনে হ'ল বাবাও এমন কথাই বলতেন। তাই চুপ ক'রে গেলাম।

পিটার্স্‌বার্গ থেকে ফিরে এলেন ভিক্টর ভলঝিকভ্‌; তাঁর অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে। একেবারে অতর্কিতেই উপস্থিত হলেন তিনি,—এমন কি একটি টেলিগ্রামেব ভূমিকা মাত্র না ক'রেই। রোজকার মতোই সন্ধ্যেবেলা ঘরের ভেতর এলাম; বৈঠকখানায় তিনি তখন পায়চারি করতে করতে গল্প বলছিলেন। তাঁর দাড়িকামানো মুখখানা বেশ উজ্জ্বল,—অন্তত দশটা বছরের ছোট দেখাচ্ছিল তাঁকে! তাঁর মেয়ে মেজেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে ট্রাংকের মধ্যে থেকে বাক্স বোতল

বই নামিয়ে প্যাভেল চাকরটার হাতে দিচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই এঞ্জিনীয়ারকে দেখে আমি এক পা পিছিয়ে গেলাম ; তিনি কিন্তু আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—

"এই, এই যে ! তোমাকে দেখে সত্যিই বেশ খুশি হয়েছি, মিষ্টার চিত্রকর ! মাশা সব কথা আগেই আমাকে বলেছে। তোমার প্রশংসায় সে আত্মহারা। আমি বলছি—হ্যাঁ তোমাকে আমি সমর্থন করছি।"—আমার হাত ধ'রেই তিনি বলতে লাগলেন—"হ্যাট্‌কোট প'রে অযথা গভমেণ্টের কাগজ খরচ করার চেয়ে ভালো একজন শ্রমিক হওয়া তো সাধু কাজ, বুদ্ধিমানেরই কাজ। আমি নিজেই এই দু'খানা হাত দিয়ে কাজ করেছি বেলজিয়ামে, দু'বছর ছিলাম মিস্ত্রী······"

তাব গায়ে খাটো একটা জ্যাকেট ও ঘরোয়া পা-জামা। বাতে-ধরা লোকের মতো এদিক ওদিক হেলে দুলে তিনি হাঁটছিলেন আর হাত ঘষছিলেন। কি একটা সুর গুন গুন করতে করতে তিনি এমন একটা ভঙ্গী কবলেন যে তাঁর সর্বাংগ দিয়েই যেন তৃপ্তি বিকশিত হয়ে উঠলো। এতোদিন পরে আবার বাড়ীর আরাম-নীড়টির মধ্যে এসে পড়েছেন, আমেজ ভরে আবার চান করা চলবে ধারাজলের নীচে !

রাতে খেতে খেতে বললেন তিনি,—"না, তোমাদের সংগে ঝগড়া করবো কেন ? বেশ লোক তোমরা সবাই। কিন্তু, ঐ শারীরিক শ্রমের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলেই, বা কিষাণদের হয়ে লড়তে গেলেই তোমরা হয়ে দাঁড়াও বিদ্রোহী ! কিন্তু তুমি তো বিদ্রোহী নও, তুমি তো ভোদকা খাও না।"

এঞ্জিনীয়ারকে খুশি করার জন্য ভোদকা খেলাম, সুরাও কিছুটা ! খেলাম পনীর, কাবাব ও নোন্‌তা খাবার। এঞ্জিনীয়ার সাহেব বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছেন কত রকমের সুস্বাদু খাবার ও বিদেশী সুরা ;

চমৎকার,—পয়লা নম্বর সব জিনিষ। কোনোও অজ্ঞাত কারণে এঞ্জিনীয়ার সাহেব বিদেশ থেকে মদ ও সিগার পান সস্তা দামে,—শুল্ক দিতে হয় না। কয়েকটি লোক কেন যে তাকে নোন্‌তা খাবার ও ষ্টার্জিন মাছ সেলামি দিয়ে যায়—তাও বুঝে ওঠা ভার! ফ্লাট বাড়ীটায় থাকেন তিনি বিনা ভাড়ায়। কারণ, তাঁর বাড়ীর মালিকই যে রেললাইনে কেরোসিন সরবরাহ করে! এঞ্জিনীয়ার ও তাঁর মেয়েকে দেখে মনে হ'ল পৃথিবীর সেরা সব জিনিষই তাঁদের পদতলে এসে গড়াগড়ি যাচ্ছে একেবারে স্বেচ্ছায়—এবং একদম বিনামূল্যে!

এখনো তাদের দেখতে যাই বটে, কিন্তু আগের সেই আগ্রহ নিয়ে আর নয়। এঞ্জিনীয়ারকে দেখে আমার আত্মা যেন সংকুচিত হয়ে ওঠে, কেমন বাধো বাধো ঠেকে আমার। তাঁর উজ্জ্বল চোখের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না,—আমাকে পীড়িত ক'রে তোলে তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর কটু মন্তব্য! কিছু দিন আগেও এই লালমুখো ভুঁড়িওয়ালা লোকটির অধীনে চাকুরীকালে কী যে অভদ্র ব্যবহার পেয়েছি—সেকথাও মনকে বিষিয়ে রেখেছে। তিনি আজ অবশ্যি একহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমাকে নিয়ে পায়চারি করছেন,—কিন্তু সবসময়েই আমার মনে হয় আগের মতোই তিনি আমাকে মনে করেন হীন, ক্ষুদ্র; তবু সবকিছুই সহ্য ক'রে যাচ্ছেন মেয়ের খাতিরে মাত্র! প্রাণ খুলে আমি হাসতে পারি না, কথা বলতে বেধে যায়; তার ফলে আমার ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায় অস্বাভাবিক। প্রতিমুহূর্তেই শংকা হয়, এই বুঝি তিনি আমাকে হাঁদারাম ব'লে ভর্ৎসনা করতে থাকবেন, চাকরকেও করেন যেমন।

সরল শ্রমিকের সমস্ত সত্তাই এতে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো!

আমি 'ছোটলোক', আমি 'রঙ্দার',—আর আমিই কিনা ছুটে যাই ধনীর দুয়ারে! আমার কাছে যারা দলছাড়া, যারা নাগালের বাইরে, সমস্ত শহরটায় থাকে যারা নিছক বিদেশীর মতো—তাদের কাছে! প্রতিদিনই আমি পেট পুরে পান করি দামী সুরা, বিচিত্র সব সুস্বাদু খাবার,—কিন্তু আমার বিবেক এই অসংগত আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। বাড়ী ফেরার সময় বিষণ্ণমুখে আমি সমস্ত লোকের পাশ কেটে যাই, লোকের মুখে সোজা তাকাতে পারি না, আড় চোখে দেখি তাদের,—আমি যেন সত্যিই একঘরে, সত্যিই বিধর্মী! এঞ্জিনীয়ারের বাড়ী থেকে ফিরবার পথে আমার ভরাপেটের জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠি।

সবচেয়ে ভয় হ'ল মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার, পথ ভুল করবার। রাস্তায় হাঁটি, কাজ করি, কথা বলি সংগীদের সাথে, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ঘুরছে একটি মাত্র চিন্তাসূত্র—সন্ধ্যেবেলা কখন মেরিয়া ভিক্টরভ্নার কাছে যাবো! তার মিষ্টি কথা, তার হাসি, তার চলনভঙ্গী ছবির মতো এসে দাঁড়ায় শুধু। তার কাছে যাবার আগে আজকাল আয়নার সামনেই কেটে যায় অনেকক্ষণ, আমার সার্জের ট্রাউজারটা এখন আমারই চক্ষুশূল, অথচ এই দামী জিনিষটার জন্য মনের মধ্যে কষ্টও হয়। এবং সংগে সংগেই এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য ঘৃণাও হয় নিজের উপর।

মেরিয়ার ঘরে ঢুকতে গেলে সে যখন হঠাৎ ব'লে ওঠে—"দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, পোষাকটা প'রে নেই।"—আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকি তার পোষাকের মিষ্টি খসখসানি, আর আমার সমস্ত শরীর যেন কেমন ক'রে ওঠে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীই যেন স'রে যায় কোথায়! রাস্তায় কোনো মেয়ে দেখলে, এমন কি অনেক দূরে

দেখলেও, আমি মেরিয়ার সংগে তাদের তুলনা করতে থাকি! ওই সব মেয়েদের মনে হয় বিশ্রী, অমার্জিত,—পোষাকটা পর্যন্ত তারা পরতে জানে না, জানে না ঠিক রকম চলতে। এইসব তুলনার সময় মনের মধ্যে জেগে ওঠে শুধু মেরিয়াকে। তার মতো নেই আর কেউই। আমাদের দু'জনের কথা স্বপ্ন দেখি রাতে।

একদিন এঞ্জিনীয়ারের সংগে খেতে ব'সে একটা প্রকাণ্ড চিংড়ি মাছ খেয়ে ফেললাম। তারপরে বাড়ী যেতে যেতে মনে পড়লো, মেরিয়ার বাবা আমাকে আজ 'মাই ডিয়ার' ব'লে সম্বোধন করেছেন দু' দুবার। বুঝলাম যে আমার সংগে তাঁরা সদয় ব্যবহারই করছেন। ঘর-তাড়ানো একটা কুকুরের সংগেও হয়তো এমনি ব্যবহারই করতেন! আসলে, আমাকে নিয়ে তাঁরা মজাই করছেন খালি, তারপর একদিন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে কুকুরের মতোই আমাকে তাড়িয়ে দেবেন সোজা। লজ্জিত আহত, মর্মান্তিকভাবেই আহত হ'লাম আমি, দুচোখ ভ'রে এল অশ্রু। কী হীন অপমান! আকাশের দিকে মুখ তুলে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম,—এমনটি আর কক্ষনো হবে না।

পরদিন ডলঝিকভদের ওখানে যাইনি। সন্ধ্যারাত, ঘন অন্ধকার, বৃষ্টি হচ্ছে চারদিকে,—গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীট দিয়ে চলেছি আমাদের বাড়ীর জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে। আঝোগিনদের বাড়ীতে ঘুমিয়ে আছে সবাই; আলো জ্বলছে বাড়ীর এক প্রান্তে। মাদাম আঝোগিন তার ঘরে ব'সে তিন-মোমের আলোতে সেলাই ক'রে চলেছেন, অর্থাৎ তাঁর ধারণায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করছেন তিনি! আমাদের বাড়ীটা অন্ধকারে নিঝুম। ডলঝিকভদের বাড়ীটায় কিন্তু ঠিক উল্টো,—জানালায় জ্বলছে আলো, কিন্তু পর্দা ও ফুলঝুরির মাঝ দিয়ে স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ছে না। রাস্তা দিয়ে উপর নীচে

পায়চারি করতে লাগলাম, বসন্তের হিম-বর্ষায় নেয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রাম। বাবা ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন। এক্ মিনিটকাল পরেই জানলায় জ্ব'লে উঠলো একটা আলো, আমার বোনকেও দেখতে পেলাম। একহাতে লণ্ঠন নিয়ে তাড়াতাড়ি করছিল সে, আর এক হাতে চুলগুলো গুছিয়ে রাখছিল। বাবা বৈঠকখানায় পায়চারি করতে করতে হাত কচলাচ্ছিলেন। এদিকে, বোন একটা নিচু চেয়ারে ব'সে আছে নিজের ভাবনা নিয়ে,—বাবার কথা শুনতেও পাচ্ছে না!

এবারে আর তাদের দেখা গেল না, নিভে গেল বাতিটা। সেখানেও নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকার এই বর্ষার মাঝখানে নিজেকে মনে হ'ল একটা অসহায় জীব—নিয়তির খেয়ালী হাতে পরিত্যক্ত একটিভেলার মতোই। মনে হ'ল আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত কামনা, আমার এতোদিনের যত চিন্তাভাবনা, যত কথা —সমস্ত কিছুই আমার আজকার এই নিঃসংগতার তুলনায় তুচ্ছ, —আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত দুঃখের কাছে একান্তই ক্ষুদ্র। হায়, মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তি তার দুঃখের কাছে কী দুর্বল। হঠাৎ আমি ঠিক বুদ্ধিভ্রষ্টের মতোই ছুটে গিয়ে ডলঝিকভদের ঘণ্টাটা টেনে ভেঙে ফেললাম ও দুষ্টু ছেলের মতো পালিয়ে এলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। প্রতি মুহূর্তের ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, এই বুঝি ধ'রে ফেললো আমাকে! রাস্তার মাথায় এসে দম নেবার জন্যে থামলাম। চারদিকে তখন কোনো সাড়া শব্দ নেই, শুধু বৃষ্টি পড়ছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্, আর দূরে একটা পাহারাওয়ালা ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঢং ঢং ঢং।

গোটা হপ্তাই আমি আর ডলঝিকভদের ওমুখো হইনি। বিক্রী

ক'রে ফেলেছি সার্জের ট্রাউজারটা। হাতে কোনো কাজ নেই। আবার সেই ক্ষুধার জ্বালা! দু' পেন্স থেকে চার পেন্স মাত্র আয়, তাও কষ্টসাধ্য অপ্রীতিকর কাজে! হাঁটু পর্যন্ত প্যাচপ্যাচে ঠাণ্ডা কাদা, বুকের মধ্যে অসহ্য ব্যথা। তবু এসব সহ্য ক'রে আমি অতীত জীবনের স্মৃতি মুছে ফেলতে লেগে গেলাম। এঞ্জিনীয়ারের গদিতে ব'সে আরাম ক'রে মাখন মাংস খাবার এই নির্মম প্রতিশোধ যেন! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সিক্ত ক্ষুধার্ত দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই আমার পাপ-মনে জেগে ওঠে মোহময় যত লুব্ধ ছবির মিছিল। এ কি আশ্চর্য! হঠাৎ আজ বুঝলাম, আমি—ভালোবাসি আমি—সারা হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি! তখন একটি প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে রইলাম। আজকাল কঠিন পরিশ্রমে আমার দেহ আরও সুন্দর ও সমর্থ হয়ে উঠেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আচমকা সুরু হ'ল তুষার পড়া। উত্তর দিক থেকে বইতে লাগলো প্রবল হিমবায়ু। শীতকালই ফিরে এল বুঝি! কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরে এসে দেখি মেরিয়া ভিক্টরভ্না! গায়ে তার লোমশ কোট, হাত দুটি দস্তানা আঁটা।

"আপনি আমাকে আর দেখতে আসেন না কেন?"—চঞ্চল ও নির্মল চোখ দুটি তুলে বললো সে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখের দিকে মুখ তুললো সে এবং তার চোখ দেখেই বুঝতে পারলাম—আমার বিব্রত হবার কারণ সে ঠিকই ধরতে পেরেছে।

"তুমি কেন আর আমার কাছে আসো না?" আস্তে আস্তে বললো সে—"তুমি যদি নাই এসে থাকো, আমিই এসেছি তোমার কাছে।"

আমায় কাছে ঘনিয়ে এল সে,—"আমাকে ফেলে যেওনা!"—তার দু' চোখে জল,—"আমি একা, একেবারেই যে একা আমি!"

—আর কাঁদতে লাগলো সে, দু'হাতে মুখ ঢেকে বলতে লাগলো —"আমি একা! আমার জীবনটা দুঃখের, বড় দুঃখের; সারা দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই! ফেলে যেও না আমাকে।"

চোখের জল মুছবার জন্য রুমাল বের করতে করতে হাসিমুখে তাকালো সে। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। তারপর আমি বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেলাম। তার চুলের কাঁটায় আমার গাল আচড়ে রক্ত বেরুলে তবেই সেই নিবিড় চুম্বন থেকে আমি জেগে উঠলাম।

দুজনে ব'সে এবার বলতে লাগলাম কত কথা,—সে যেন আমার কত যুগ যুগান্তের প্রিয় সাথী।

(দশ)

দুদিন পরে গেলাম দ্যাবেত্‌স্নিয়াতে। সে কী আনন্দের দিন আমার। রেলপথে ষ্টেশনে যেতে যেতে অকারণেই আমি হাসছিলাম একটু একটু। সবাই ভাবছিল আমাকে মাতাল। তুষার পড়ছে, ভোরের ঘন কুয়াশা চারদিকে। তবে, রাস্তাগুলো পরিষ্কার; কাকেরা কা কা শব্দে উড়ে চলেছে তার উপর দিয়ে। মাশা ও আমি দুজনে মিলে আমাদের নীড় বাঁধবো ঠিক করলাম—মাদাম শেপ্রাকভের বাড়ীটার বিপরীত দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল শুধু ঘুঘু ও বুনো হাঁসের ভাঙা বাসার মেলা। বহু বাসা না ভেঙে ফেললে পরিষ্কার ক'রে তোলাই এক অসম্ভব ব্যাপার। অগত্যা, বড় বাড়ীটার

গুমোট ঘরগুলিতে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! স্থানীয় কিষাণদের চোখে এই বাড়ীটাই ছিল রাজপ্রাসাদ। ঘর রয়েছে বিশটার উপর; একমাত্র আসবাব হচ্ছে পুরানো একটা পিয়ানো এবং চিলেকোঠায় প'ড়ে আছে ছোটদের একটা আরাম কেদারা। মাশা যদি তার সমস্ত আসবাবপত্রও এখানে এনে জমা করে তবু ঘরটার ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা ঢাকা দিতে পারবে না······তিনটা ঘর বেছে নিলাম আমরা, একটিমাত্র জানলা বাগানের দিকে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লেগে রইলাম ঘরগুলি ঠিকঠাক ক'রে নিতে, নতুন জানলায় কাচ ও দেয়ালে কাগজ লাগালাম, বুজিয়ে দিলাম ফাটল ও গর্ত! এসব সহজ কাজ। কতবার ক'রে নদীতীরে ছুটছিলাম,—বরফ গলেছে কিনা দেখতে। কেবলি মনে হচ্ছিল—বসন্তের ষ্টার্লিং উড়ে ফিরছে আকাশে! রাতে মাশার কথা ভাবতে ভাবতে মধুর আবেশে কান পেতে শুনতে থাকতাম ইঁদুরের কুচুর কুচুর শব্দ, আর চিমনিতে হাওয়ার ঝাপটা। মনে হ'ত প্রাচীন গৃহদেবতা যেন উঁচু চিলেকুঠিতে ব'সে বারবার কাশছে।

চারদিকে গভীর তুষার, বসন্ত সুরু হ'লেও তুষার পড়ছে খুব। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে ম্যাজিকের মতো সুরু হ'ল ষ্টার্লিং পাখীর কাকলী, বাগানে বাগানে হলদে প্রজাপতির নাচ! কেমন মিষ্টি আবহাওয়া। প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যার দিকে শহরে গিয়ে মাশার সংগে দেখা করি। শুকিয়ে-আসা পথ দিয়ে হেঁটে যেতে সে কী আরাম! পায়ের তলায় নরম মাটির আদর। মাঝপথে এসে আমি ব'সে নেই একটু, চেয়ে থাকি শহরের দিকে,—কাছে যেতে কেমন ভয় লাগে! শহরটা দেখলেই আমি চিন্তিত হয়ে উঠি। আমাদের প্রণয়ের কথা শুনে আমার পরিচিত সবাই কি রকম মনে করবে আমাকে। বাবাই

বা বলবেন কি? আমাকে একটা কথা বিশেষ ক'রে ভাবিয়ে তুলেছে,—আমার জীবনটা ক্রমেই যে জটিল হয়ে উঠছে, অথচ তাকে আবার সহজ সরল ক'রে তুলবার শক্তিও তো হারিয়ে ফেলছি! ফানুসের মতো কোথায় উড়ে চলেছি, কে জানে। এখন আর অবশ্যি ভাববারও সময় নেই। কী ক'রে রোজগার করবো, বাঁচবো তাই আমার একমাত্র ভাবনা,—অথবা কী জানি, কী যে ভাবি দিনরাত।

মাশা আসতো গাড়ীতে, আমিও স্বাধীন হালকা প্রাণে তার সংগে যেতাম ছ্যাবেত্‌স্নিযায়। কোনোদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে ঘরে ফিরতাম মলিন মুখে,—মাশা আজ এল না কেন? তারপর বাগানে বা দরজায় ঢুকতেই হঠাৎ দেখতে পেতাম সুন্দর একখানি হাসিমুখ,—আমার মাশা! ও, সে এসেছে ট্রেণে, ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে। কী যে আনন্দোৎসব লেগে যেতো তখন। শাদাসিধে পোষাক তার, গলায় জড়ানো রুমাল, মাথায় টুপি,—কিন্তু পা দুটিতে দামী বিদেশী জুতো। ঠিক যেন নিখুঁত একটি অভিনেত্রী শ্রমিক মেয়ের অভিনয় ক'রে যাচ্ছে। দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে দেখতে লাগলাম আমাদের এই প্রিয় রাজ্য,—কোনটা হবে তার ঘর, কোনটা আমার, কোথায় হবে ছায়া-বীথি, কোথায় বা বাগান ও মৌচাকের মেলা!

পাতিহাঁস, মুরগী, রাজহাঁস তো আগেই রয়েছে এখানে,—আমাদের সব প্রিয় সাথীর দল! ইতিমধ্যেই আনা হয়েছে ওট গম ও নানারকম ফলমূলের বীজ! ভাঁড়ার দিকে চেয়ে চেয়েই আমরা পরিমাপ করতে থাকি—এ থেকে ফসল পাওয়া যাবে কতটা। মাশার সব কথাই আমার কানে লাগে এমন মিষ্টি, এমন বুদ্ধি মাখা—আমার জীবনের এই স্বর্ণযুগ।

এক সপ্তাহ পরে কুরিলোভ্‌কা গাঁয়ের গ্রাম্য গির্জায় বিয়ে হ'ল আমাদের,—দ্ব্যেবেত্‌স্নিয়া থেকে দু'মাইল দূরে। মাশার ইচ্ছানুসারে সব অনুষ্ঠানই হ'ল শান্তিতে, নীরবে। কিষাণ ছেলেরাই হ'ল উৎসবের সাথী। একজন পুরুত মন্ত্র পড়লো। গির্জা থেকে ফিরলাম ঘোড়ার গাড়ীতে,—মাশা নিজেই সহিস হয়ে বসলো। শহর থেকে একটিমাত্র অতিথিই এসেছে আমাদের বিয়েতে। সে আমার বোন ক্লিওপাত্রা। মাশা দিনতিনেক আগেই তাকে বিয়ের নেমন্তন্ন ক'রে রেখেছিল চিঠি লিখে। আমার বোন এল শাদা পোষাক প'রে। বিয়ের সময় সে তো আদরে ও আনন্দের আবেগে, কাঁদতেই সুরু ক'রে দিল। ঠিক মায়ের মতোই তার মায়া। আমার সুখে সে যেন পাগল হয়ে আছে। তার হাসিতে লেগে আছে সুখ-স্বপ্নের নেশা। আমাদের বিয়ের সময় তার মুখ দেখে বুঝলাম, তার কাছে ভালোবাসার চেয়ে বড কিছুই নেই আর। ভালোবাসা—এই মাটির ভালোবাসা! আর সে নিজেও স্বপ্ন দেখছে তার,—ভীরু স্বপন, দিনেরাতের অশান্ত স্বপন! সে আবেগভরে মাশাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেল, অধীর আনন্দে আত্মহারার মতো বললো তাকে,—"আমাদের মিজেইল খুব ভালো, খুব ভালো!"

বাড়ী ফিরবার আগে সে আমাকে বাগানে নিয়ে এসে বলতে লাগলো—"বাবা আহত হয়েছেন খুবই। তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া উচিত ছিল তোমার! আসলে কিন্তু খুশিই হয়েছেন তিনি। তিনি বলছিলেন যে এই বিয়ে সমাজের চোখে তুলে ধরবে তোমাকে, মেরিয়া ভিক্টরভ্‌নার সংসর্গে তোমার জীবনধারা বদলে যাবে উন্নতির দিকে। আজকাল সন্ধ্যায় প্রায়ই আমরা তোমাদের কথা বলি শুধু। বাবা কালকে সত্যি সত্যিই বলছিলেন—"আমাদের মিজেইল' ভারী আনন্দ

হ'ল শুনে। তাঁর মনে বোধহয় কোনো মৎলব আছে। তুমি নিজে তাঁর কাছে যাও—তিনি এই চান। খুব সম্ভব, তিনি নিজেই আসবেন একবার।”

তারপর আমার বোন প্রার্থনার স্বরে বলতে লাগলো—“ভগবান সহায় হোক তোমার! সুখী হও তুমি। অনীতা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেও বলছিল, ভগবান তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। সত্যি কথা, বিয়ে জীবনে শুধু আনন্দই আনে না, দুঃখও আনে। ঠিক কথা।”

মাশা ও আমি কয়েক মাইল পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে নীরবে হাঁটছিলাম আমরা। আমার হাত মাশার হাতে। প্রাণে আমার হালকা খুশি, ভালোবাসার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না এখন। বিয়ের পরে এখন আমরা একান্তই ঘনিষ্ঠ, একেবারেই যে এক। আমরা বুঝলাম যে এখন কিছুতেই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।

“তোমার বোন বেশ ভালো মানুষ। কিন্তু মনে হয়, বহু নির্যাতন সহ্য করেছে সে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভয়ানক মানুষ।”

আমি বলতে লাগলাম আমাদের ছোটবেলার কথা, কী অসহ্য অত্যাচারই সহ্য করেছি আমরা। কিছুদিন আগেও বাবা কী রকম ভাবে আমাকে মেরেছেন তাই শুনে ভয়ে সে আমার কাছে ঘনিয়ে এল,—

“না, না; আর বোলো না, সত্যি কী সাংঘাতিক!”

এখন থেকে দিনরাত এক সংগে থাকি আমরা। বড় বাড়ীটার তিনটে ঘরে থাকি আমরা, সন্ধ্যেবেলায়ই ঘরের ফাঁকা দিকটার জানলা বন্ধ ক'রে দিই। সেদিকে যেন এমন কেউ আছে—যাকে ভয় করি আমরা। ভোর হ'লেই দুজনে মিলে কাজে লেগে যাই। গাড়ী মেরামত

করি, বাগানের মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করি, ফুলের চাষ করি, রঙ্ লাগাই ঘরের ছাতে। ওট বুনবার সময় হ'লে মাটি চষি, আগাছা বাছি, বীজ বুনি ;—অন্য মজুরদের পাশে কাজ ক'রে যাই সচেতনভাবেই। কিন্তু রাতে খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, বর্ষায় ঠাণ্ডায় ও কাদায় জ্বালা করতে থাকে মুখ ও হাত-পা। ঘুমেও স্বপ্ন দেখি ক্ষেত চষা! কিন্তু মাঠের কাজে আকর্ষণ নেই আমার। চাষবাস বুঝিও না,—পারিও না। খুব সম্ভবত, আমাদের বংশের মধ্যেই চাষীর রক্ত নেই তাই। আমাদের মধ্যে প্রবাহিত খাঁটি শহরের শোণিত। প্রকৃতিকে ভালোবাসি আমি প্রাণের মতোই, ভালোবাসি মাঠ-প্রান্তর বন-বীথিকা। কিন্তু ঘর্মাক্ত দেহে বোঝায় বাঁকা পিঠে কিষাণেরা যে "ডানে, বাঁয়ে" ব'লে লাঙল ঠেলে—আমার মনে হয় তা হচ্ছে শ্রমের স্থূল ও জঘন্য রূপ। এবং এইসব বিশ্রী কাজ দেখে আমার মনে জেগে ওঠে শুধু প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনধারা,—মানুষ যখনও আগুনের ব্যবহার শেখেনি! প্রকাণ্ড ষাঁড়ের ভয়ানক গোঁ, গ্রামের মধ্য দিয়ে পাগলা ঘোড়ার লাফঝাঁপ দেখলেও ভয় হয় আমার। এক কথায়, ভয়ানক শিংওয়ালা এই ভেড়া কুকুর বা রাজহাঁস,—এই সমস্ত কিছুর পরিবেশ আমার সামনে জেগে ওঠে সেই আদিম অসভ্য জীবনধারা। বিশেষ ক'রে মেঘলা দিনেই মনটা খারাপ হ'য়ে থাকে,—কালো কালো চষা মাঠের উপর মেঘেরা যখন ঝুলে থাকে। তারপরে, চষবার বা বুনবার সময় দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে আমার কাজ, আর আমার মনে হ'তে থাকে যে আসলে কাজ করছি না আমি, মজাই করছি শুধু! এর চেয়ে ঢের ঢের পছন্দ করি বাড়ীতে ব'সে কাজ করা—বিশেষ ক'রে ছাদে রঙ্ করা।

বাগান ও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মিল পর্যন্ত হেঁটে যাই। মিলটা ভাড়া

দেওয়া হয়েছে স্তেপান নামে কুরিলভ্কার এক কিষাণের কাছে। সুন্দর ও শক্তিমান মানুষ সে। নিজের কাজ করতে ভালোবাসে না সে, তা লাভজনকও মনে করে না। এখানে এই মিলেই থাকে সে, বাড়ী থাকার দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যে। চামড়ার কাজ করে সে, তার গায়ে সবসময় আলকাতরা ও চামড়ার গন্ধ! কথা বলতে ভালোবাসে না বড় একটা, অলস উদাসীন মানুষ! মিলের দোরে বা নদীর পারে ব'সে ব'সে সে জিভ দিয়ে লু-লু ক'রে শিষ্ দেয় শুধু! তার বৌ ও শাশুড়ী দুজনেই যেমন নির্জীব তেমনি ঠাণ্ডা মেজাজী। কুরিলোভ্কা থেকে মাঝে মাঝে তারা স্তেপানকে দেখতে আসে ও ভদ্রতা ক'রে ডাকে তাকে "স্তেপান মহাশয়!" এদিকে সে তো নদীর পারে ব'সে আপন মনে শব্দ ক'রে যাচ্ছে লু লু লু লু, কথার জবাবও দেয় না, মাথাটাও একটু হেলায় না পর্যন্ত। একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কেটে যায় নিঃশব্দে, শাশুড়ী আর তার মেয়ে কানাকানি করতে থাকে শুধু। তারপর, তারা উঠে দাঁড়ায়, কিছুকাল তাকিয়ে থাকে তার দিকে,—একবার যদি সে ফিরে চায় এই আশায়। তারপর মাথা নুইয়ে নরম স্বরে বলে—

"তাহ'লে আসি এবার, স্তেপান আইভানিচ!"

এবারে তারা চ'লে গেলেই স্তেপান উঠে ব'সে তুলে নেয় তাদের দিয়ে যাওয়া পার্সেলটা,—একটা জামা ও কয়েকটা পিঠে! স্তেপান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চক্ষুবুজে তাদের উদ্দেশে বলে—"নারী, নারী, হ্যাঁ নারী বটে!"

মিলে কাজ চলে দু'দুটো জাঁতা কলে। স্তেপানকে সাহায্য করি আমি। একাজ ভালো লাগে আমার; স্তেপান চ'লে গেলে তার জায়গায় ব'সে কাজ করতে খুশিই হই আমি।

(এগারো)

উষ্ণ উজ্জ্বল আবহাওয়ার শেষে এল স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা দিন। সমস্ত মে মাস ধ'রেই বৃষ্টি। মিলের চলন্ত চাকার ও বৃষ্টির শব্দে মন বসে না কাজে, ঘুম আসে শুধু। মেজে কাঁপছে, ময়দার গন্ধ আসছে—সে গন্ধেও যেন ঘুমের নেশা।

দিনে ছুবার আসতো আমার স্ত্রী, এবং প্রত্যেকদিনই সে বলতো—"এই নাকি গ্রীষ্ম, বাব্বাঃ, শীতও ভালো এর চেয়ে!"

চা ও অমলেট বানিয়ে খেতাম ছু'জনে মিলে, অথবা নীরবে ব'সে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কখন বৃষ্টি থামবে তার প্রতীক্ষায়। স্তেপান একবার মেলায় চ'লে গেলে মাশাও মিলে ছিল একরাত। ভোরে কখন উঠলাম বলতে পারি না। বাইরে চেয়ে দেখি বর্ষামেঘে ছেয়ে আছে সমস্ত আকাশ, তখনো সবেমাত্র ভোর। মাশা ও আমি মিলের-পুকুরে এসে একটা জাল টেনে তুললাম। এই জালটা আমার সামনেই স্তেপান ফেলে রেখেছিল। একটা মস্ত বড় পাইক ও ক্রে মাছ ছুটোছুটি করছিল জালের মধ্যে, ক্রে মাছটা তো জালের মধ্যেই লাফিয়ে উঠছিলো মাথার গুঁতো দিয়ে দিয়ে।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওদের!"—মাশা বললো—"ওদেরো সুখে থাকতে দাও।"

খুব ভোরে জেগে উঠতাম এবং সারাদিন বিশেষ কোনো কাজ থাকতো না ব'লে দিনটা মনে হ'ত মস্ত বড়। জীবনের বড় দিন। সন্ধ্যাবেলা স্তেপান ফিরলো, আমিও বাড়ী চললাম।

"তোমার বাবা এসেছিলেন আজ!"—মাশা বলছিল।

"কোথায় তিনি?"

"চ'লে গেছেন, তাঁর সংগে কিছুতেই দেখা করবো না আমি।"

চুপ ক'রে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবার জন্য দুঃখ পাচ্ছি বুঝে সে বললো—

"দেখো, নিজের মধ্যে সংগতি থাকা দরকার। আমি সত্যিই দেখা করতে চাই না এবং তাঁকেও ব'লে পাঠিয়েছি—কষ্ট ক'রে আর আমাদের সংগে দেখা করতে যেন আসেন না তিনি।"

এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে প'ড়ে শহরের দিকে চললাম,—বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো। পথ কাদায় পিছল ও স্যাঁতসেঁতে। বিয়েব পরে এই প্রথমবার আমার মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে পড়লো এবং সমস্ত ধূসর দিনের ক্লান্তি শেষে আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো একটা কথা—হয়তো ঠিক করছি না আমি। যেভাবে চলা উচিত সেভাবে চলছি না আমি। দিন দিন নষ্ট হতে চলেছি আমি,—বার বার একটা অলস নৈরাশ্য আমাকে পেয়ে বসে। নড়তে চড়তে পর্যন্ত ইচ্ছে হয় না। একটু দূরে গিয়েই "থাকগে।"—ব'লে ফিরে এলাম।

এঞ্জিনীয়ার ওভারকোট গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের আঙিনার মাঝখানেই।

"আসবাব সব কোথায়! রাজার হালের কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ ছিল এখানে। ছিল সবই, আর আজ দেয়ালগুলি প'ড়ে আছে ফাঁকা। সবসমেতই কিনেছিলাম জায়গাটা। বুড়ীটার মরণও হয় না!"

মোয়েজি টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, জড়সড়ো-ভাবে। বয়স বছর পঁচিশেক, মুখে ছিট্ ছিট্ দাগ। বিগত জেনারেলের বিধবা স্ত্রীর অধীনে কাজ করে সে। একটা গাল তার অন্য গালের চেয়ে ফুলানো,—অনেকক্ষণ সেই গালের উপর শুয়ে ছিলো ব'লেই বোধহয় অমনটা হয়েছে।

"দেখুন, আপনি অনুগ্রহ ক'রে জায়গাটা কিনেছিলেন বটে, কিন্তু আসবাব ছিল না তো!" খাপছাড়া ভাবেই বললো সে—"ঠিকই মনে আছে আমার।"

"চোপ্ রও!"—ধমকে উঠলেন এঞ্জিনীয়ার; রাগের চোটে লাল হ'য়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি···তার ক্রুদ্ধকণ্ঠ বাগানের দিকে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

(বারো)

বাগানে বা আঙিনায় কাজ করার সময় কোমরে হাত রেখে মোয়েজি দাঁড়িয়ে থাকে পাশেই; ক্ষুদে চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে বেয়াদবের মতো। আমার মেজাজ এত গরম হ'য়ে উঠতো যে কাজ ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি চ'লে আসতাম ঘরে।

স্তেপানের কাছে শুনেছি এই মোয়েজি হ'ল মাদাম শেপ্রাকভের প্রণয়ী। আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি, মাদাম শেপ্রাকভের কাছে কেউ ধার চাইতে এলে প্রথমেই আবেদন জানায় মোয়েজির কাছে। একবার এক মিশকালো কিষাণকে—লোকটা বোধহয় কয়লাখনির কুলী,—হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছি মোয়েজির পায়ের কাছে। কখনো কখনো দু-একটা চুপি চুপি কথার পরে মোয়েজি নিজেই টাকা ধার দিয়ে দেয়,—তার প্রণয়িনীকে জানায়ও না। এ থেকে বুঝলাম যে তলে তলে নিজেই সে ব্যবসা ফেঁদেছে একটা।

আমার বাগানে চড়াও হ'য়ে আসে সে, আমাদের পশুপাখী শিকার ক'রে মাশা ও আমার সামনেই! ভাঁড়ার থেকে খাবার চুরি করে সে, আমাদের আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে যায়, একবার জিজ্ঞাসা করার ধারও ধারে না। দুবেত্‌স্নিয়া যেন আমাদেরই নয়! লোকটার

উপরে হাড়ে হাড়ে চটা মাশা। মাশার মুখ লাল হয়ে ওঠে, সে বলতে থাকে—"এই জানোয়ারগুলোর সংগে আরো আঠারো মাস থাকা, ওঃ কী সাংঘাতিক!"

মাদাম শেপ্রাকভের ছেলে আইভাণ হ'ল রেলের গার্ড। শীতকালে সে শুকিয়ে শুবিয়ে এত দুর্বল হ'য়ে পড়ে যে এক গ্লাস খেলেই তার কিস্তিমাত; রোদ থেকে স'রে গেলেই সে হি হি ক'রে কাঁপতে থাকে। গার্ডের পোষাক পরে সে বিরক্ত মেজাজেই, লজ্জিত হয় নিজের দিকে চেয়ে,—কিন্তু গার্ডের চাকুরী সে বেশ লাভজনক ব'লেই মনে করে। কারণ দুহাতে সে মোমচুরি ক'রে বিক্রী ক'রে দেয়। আমাকে বিবাহিত জীবনে সৌভাগ্যবান দেখে তার মধ্যে জেগে উঠেছে ঈর্ষা;—হয়তো একটা অস্পষ্ট আশাও তার মনে আছে, হয়তো অমনি একটা কিছু তার কপালেও এসে জুটে যাবে। মাশাকে দেখে সে লুব্ধ ও ক্ষুধিত চোখে,—আমার কাছে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে কেমন খাই-দাই আমরা। তার চোপসানো গালে, কুৎসিৎ মুখে দেখা দেয় মিষ্টি হাসি, আঙ্গুলগুলিকে নাড়তে থাকে শুধু,—আমার খুশিটুকু যেন সে একটু অংশ উপভোগ করছে।

"শোনো হে নেই-মামার-চেয়ে-কাণামামা!"—বলছিল সে আর প্রতিমুহূর্তে সিগ্রেট ধরাচ্ছিল শুধু—"দেখো, আমার এই দিনগুলো যাচ্ছে একেবারেই বিশ্রীভাবে। সব চেয়ে অসহ্য হ'ল, একটা কুলীও আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলতে পারে—"গার্ড, এই গার্ড!" ট্রেণের সব কথাই শুনি তো, তাই দেখো, আমার জীবনটা হ'ল পশুর জীবন! আমার মা-ই আমাকে গোল্লায় পাঠালো। ট্রেণে এক ডাক্তার বলছিল —"বাপ-মা যদি খারাপ হয়, ছেলে তো খুনী মাতাল হবেই। তবেই বুঝে দেখো।"

টলতে টলতে সে আঙিনায় এল, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি! টেনে টেনে শ্বাস ফেলে সে হাসতে হাসতে শেষে চীৎকার ক'রে উঠছিল ও যাচ্ছেতাই ব'লে যাচ্ছিল প্রলাপের মতো। তার নেশা জড়ানো কথার মধ্য থেকে—এইটুকু মাত্র বুঝতে পেরেছিলাম—'মা কোথায়? আমার মা?' এমন ভাবে বলছিল সে,—ভিড়ের মধ্যে মাকে হারিয়ে কচিখোকাই যেন হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে! তাকে আমাদের বাগানে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম গাছের ছায়ায়; সমস্ত রাত পাখা ক'রে তার পাশে ব'সে রইলাম মাশা ও আমি। লোকটা যাইহোক পীড়িত! মাশা তার মলিন শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে বলছিল—

"হায় ভগবান! এই জানোয়ারগুলোর সংগে আরো দেড় বছর থাকতে হবে! ওঃ কী ভয়ানক, কী সাংঘাতিক!"

কিষাণরা আমাদের কী জ্বালা-যন্ত্রণাই দিয়েছে! সুখের বসন্ত দিনগুলি ভ'রে তুলেছে বিশ্রী বিস্বাদে। আমার স্ত্রী একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলো। ষাট জন ছাত্র নিয়ে স্কুলের একটা খসড়া খাড়া করলাম, জিলাবোর্ডও এ প্রস্তাব সমর্থন করলো কুরিলোভ্‌কা নামক বড় গ্রামটায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো এই সর্তে। গ্রামটা দ্যুবেত্‌স্নিয়া থেকে মাত্র দু মাইল দূরে। আশেপাশের গ্রাম থেকে—আমাদের দ্যুবেত্‌স্নিয়া থেকেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে যেতো কুরিলোভ্‌কার স্কুলে; সে স্কুল এখন জীর্ণ পুরাতন, সংকীর্ণ তার ঘর, তার মেজেতে পর্যন্ত পা বাড়াতে ভয় লাগে। মার্চের শেষেই মাশার ইচ্ছানুসারে তাকে কুরিলোভ্‌কা স্কুলের কর্ত্রী করা হ'ল। এপ্রিলের প্রথমেই তিনবার গ্রাম্য-সমিতির অধিবেশন হ'ল। কিষাণদের বোঝাতে চেষ্টা করা হ'ল যে পুরোনো বাড়ীটা একান্তই জীর্ণ ও সংকীর্ণ,কাজেই নতুন একটা বাড়ী প্রতিষ্ঠা করা একান্তই প্রয়োজন। জিলাবোর্ডের একজন সভ্য ও

কিষাণ স্কুল-সমূহের পরিদর্শক এলেন, তারাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতেকে অধিবেশনের পরেই কিষাণেরা আমাদের ঘিরে ধ'রে হাত পেতে বসে—এক কলসী ভোদ্‌কা চাই। ভিড়ের চোটে গা দিয়ে ঘাম ছোটে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ি, বিরক্তিতে অস্বস্তিতে ফিরে আসি বাড়ী।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি কিষাণরা স্কুলের জন্য আলাদা ক'রে রাখে নির্দিষ্ট জমি,—নিজেদের ঘোড়ায় ক'রেই শহর থেকে বাড়ীর মাল-মশলা আনতে রাজি হয়। রবি-শস্য বুনবার পরের রবি বারেই তারা দ্যুবেত্‌স্কিয়া ও কুরিলোভ্‌কা থেকে গাড়ী নিয়ে রওনা হ'ল ভিত্তি-স্থাপনের ইটের জন্যে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই রওনা হ'ল বটে, ফিরলো কিন্তু ঠিক সন্ধ্যে-রাতে। কিষাণরা তখন মদে চুর, ভেঙে পড়ছে নিদারুণ ক্লান্তিতে।

দুর্ভাগ্যবশত, সমস্ত মে মাস ধ'রেই চললো বর্ষা আর ঠাণ্ডার অত্যাচার। কাদায় ভ'রে গেছে চারদিক। গাড়ীগুলি শহর থেকে চ'লে আসে আমাদের আঙিনা পর্যন্ত। সে কী দৃশ্য! সে কী অগ্নি-পরীক্ষা। পেট মোটা একটা ঘোড়া বাড়ীর ফটকে এসে দু পা ফাঁক ক'রে দাঁড়াবে এবং আঙিনার মধ্যে এগোতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাবে। ছ হাত লম্বা এক একটা বিম মালগাড়ী ভ'রে ঠেলে আনে একটা কিষাণ, কাদার নরক কুণ্ডের মধ্য দিয়ে সে এগোতে থাকে ক্ষ্যাপার মতো। তারপর, তক্তা-বোঝাই গাড়ী আসে··· একটার পর একটা।······দেখতে দেখতে আঙিনাটা স্তূপাকার হয়ে ওঠে—কেবল ঘোড়া বিম আর তক্তা! মজুর মেয়ে-পুরুষেরা তাদের বিস্রস্ত পোষাক দুহাতে হাঁটুর উপর তুলে কটমট ক'রে তাকাতে থাকে, আমাদের জানলার দিকে সোরগোল ক'রে কর্ত্রী ঠাকুরুণকে

বেরিয়ে আসতে বলে। মুখে মুখে ছিটকে ওঠে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ। মোয়েজ্‌জি এদিকে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে থাকে।

"আর মাল টানতে পারবো না আমরা"—কিষাণরা চীৎকার করে—"হাড়গোড় ভেঙে গেছে আমাদের। দরকার হয়, যান না, উনি নিজে গিয়েই নিয়ে আস্থন না।"

মাশার মলিন মুখখানি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ভয় হয়, এই বুঝি তারা সদলবলে ঘরে ঢুকে পড়লো! ভয়ে ভয়ে সে বের ক'রে দেয় আধকলসী ভোদকা। আর তক্ষুনি মন্ত্রের মতো থেমে যায় সব গণ্ডগোল। লম্বা লম্বা বিমগুলি একে একে সাজিয়ে রাখা হয় আঙিনার প্রান্তে।

স্কুল-বাড়ী তৈরী হওয়া দেখতে রওনা হচ্ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবেই এসে বলে,—

"কিষাণরা যা জঘন্য জীব, তোমায় আবার কিছু একটা না ক'রে বসে। দাঁড়াও, আমিও যাবো তোমার সংগে।"

গাড়ী চেপে দুজনেই চললাম কুরিলোভ্‌কায়,—মিস্ত্রীরা সেখানে বায়না ধরলো মদ খাবার। এবারে ভিত্তি স্থাপন হবে। কিন্তু রাজমিস্ত্রীই এদিকে অনুপস্থিত। আবার রাজমিস্ত্রী এলে ধরা পড়লো যে বালিই আনা হয়নি! সুযোগ বুঝে মজুরেরা গোঁ ধ'রে বসলো,—গাড়ী পিছু তিরিশ কপেকের কমে পরবে না তারা। অথচ স্কুল বাড়ী থেকে নদীর বালুতীর সিকি মাইলও নয়,—তারপর দু' এক গাড়ী হ'লেও তবু কথা ছিল, মালও হবে পাঁচ-শ গাড়ীর বেশী। ঝগড়াঝাঁটি, অন্যায় আবদার আর গালিগালাজের অন্ত নেই। আমার স্ত্রী তো রেগেই আগুন! রাজমিস্ত্রীদের কর্তা পেত্রভ—সত্তর বছরের এক বুড়ো। সে মাশার হাত ধ'রে বললো—

"আপনিই দেখুন একবার, দেখুন না? শুধু বালিটা এলেই হয়, এক্ষুণি দশ দশটা লোক লাগিয়ে দিচ্ছি, ব্যস, দেখতে না দেখতেই হয়ে যাবে সব। আপনিই দেখুন না একবার!"

বালি আনা হ'ল বটে, কিন্তু সেই অজুহাতেই চ'লে গেল দুদিন তিনদিন ক'রে পূরো হপ্তাটা এবং ভিতের জায়গায় হাঁ ক'রে রইলো কতকগুলা ভিত-কাটা গর্ত।

আমার স্ত্রী বিপন্নের মতোই বলতে লাগলো—"ওঃ মাথাই খারাপ হ'ল আমার। ওঃ কী সব লোক, কী সাংঘাতিক!"

এই সব বিশৃংখলার মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন এঞ্জিনীয়ার সাহেব, সংগে মদ ও মিষ্টি খাবার। পেট পূরে খেয়ে তিনি বারান্দায় শুয়ে পড়লেন এবং সংগে সংগেই সুরু ক'রে দিলেন গভীর নাসিকা গর্জন। আঙিনায় নীচে কিষাণরা মাথা নেড়ে নেড়ে বলছিল—"আচ্ছা তো?"

এঞ্জিনীয়ারের আগমনে খুশি হয় নি মাশা। বাবার পরামর্শ নিলেও বাবাকে বিশ্বাস নেই তার। লম্বা এক ঘুমের পরে বিরক্ত মনে উঠে তিনি আমার বিষয়ে যা-তা অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগলেন—ত্যুবেত্স্মিয়ার টাকাটাই জলে গেছে ইত্যাদি। হতভাগ্য মাশার মুখে ঘনিয়ে এলো ব্যথার ছায়া সে নানা অভিযোগ জানাচ্ছিল, এবং তার বাবা হাই তুলতে তুলতে বলছিলেন যে, সমস্ত কিষাণদেরই পিঠের চামড়া তুলে ফেলা দরকার।

আমাদের বিবাহ ও জীবনপদ্ধতি তাঁর মতে নিছক একটি পরিহাস —একটী খামখেয়ালী, একটি ইয়াকি বিশেষ!

"আগেও সে এরকমটা করেছে"—মাশার কথা বলছিলেন তিনি— "একবার নিজেকে ঠাওরালো সে মস্ত বড় এক গায়িকা! তার পরে হঠাৎ একদিন উধাও! পুরো দু'মাস ধ'রে খুঁজে খুঁজে ফিরলাম।

আরে সর্বনাশ! একমাত্র টেলিগ্রামেই খরচ হ'ল পুরো হাজারটি রুবল।"

এখন আর তিনি আমাকে 'মিঃ চিত্রকর' ব'লে ঠাট্টাও করেন না বা আমার শ্রমজীবন সমর্থনসূচক একটী বাক্যও ব্যয় করেন না,—শুধু বলেন,—"অদ্ভুত লোক তুমি। একেবারেই মাথা পাগল। আমি নিজে কিছু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে যাচ্ছিনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত মঙ্গল হবে না তোমার।"

রাতে ঘুমুতে পারলোনা মাশা, শোবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে কী ভাবছিল শুধু! খাবার সময় এখন আর সেই হাসিঠাট্টা নেই, নেই মাশার মুখে সেই নানারকম ভঙ্গী, মিষ্টি ভেংচি! নিজেকে মনে হতে লাগলো হতভাগ্য। বর্ষা আরম্ভ হ'লে তার প্রত্যেকটি বৃষ্টির ফোঁটাই যেন গুলির মতো এসে আমার বুকে বেঁধে, আমার বুক ভেঙে যায়। ইচ্ছা হয় মাশার সামনে নতজানু হয়ে ব'সে এই আবহাওয়ার জন্যে ক্ষমা চাই। আঙিনায় কিষাণরা গণ্ডগোল করতে থাকলে নিজেকেই মনে হয় অপরাধী! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ঠাঁয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ভাবি শুধু—কী চমৎকার মেয়ে এই মাশা, কী সুন্দর! পাগলের মতো ভালোবাসি তাকে, তার প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকটি কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে পড়ি। পড়াশোনায় ডুবে থাকার নেশা ছিল তার, পড়তে ভালোবাসতো সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার কৃষিজ্ঞান গ্রন্থজাত, তবুও তার জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হতে হয়; তার প্রত্যেকটি উপদেশই বেশ মূল্যবান, তার একটা কথাও কোনোদিন ঠেলে ফেলা হয়নি। তা ছাড়া, কী নির্মল প্রাণ তার, কেমন মার্জিত রুচি, কেমন দয়া, কেমন উদারতা! এমন উদারতা একমাত্র উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেই থাকা সম্ভব।

আমার এই বিশৃংখল জীবন-পরিবেশের তুচ্ছ কাজকর্ম, ক্ষুদ্র দুর্ভাবনা—সমস্তই এখন এই বুদ্ধিমতী নারীটির কাছে দুঃসহ শোকের কারণ হয়ে উঠলো। রাতে সে ঘুমুতে পারে না, আমার মাথা ঘুরতে থাকে, গলার মধ্যে একটা ডেলার মতো কি যেন আটকে আসে বারবার; কী যে করি,—দিশেহারার মতো ঘুরতে থাকি শুধু।

শহরে ছুটলাম, মাশাকে এনে দিলাম একরাশ বই পত্রিকা ও ফুল! স্তেপানের সংগী হয়ে ধরলাম মাছ, বর্ষার ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলা ডুবিয়ে। নিজেকে অবনত ক'রে কিষাণদের কাছে পর্যন্ত মিনতি করলাম,—তারা যাতে অমন হৈ চৈ না করে; ভোদকা পরিবেশনে খুশি রাখলাম তাদের, হাত করলাম নানা প্রলোভন দেখিয়ে। ওঃ কত বোকামিই না সহ্য করতে হয়েছে!

বর্ষা থামলো এবার, শুকোলো মাটী। ভোর চারটাতেই খুশিতে ঘুম ভেঙে যায় লাল আকাশের দিকে চেয়ে। তারপর বাগানে বেড়ানো। ফুলেরা সেখানে শিশিরে টলমল করে, পাখীর কাকলী আর মৌমাছির গুঞ্জন সেখানে। চারদিকে আনত নির্মল নীলাকাশ, একটুকুরা মেঘ নেই কোথাও। বনপ্রান্তর নদী-বিল মাঠ-ঘাট এত সুন্দর! তবু—তবু তারই ফাঁক দিয়ে নানা স্মৃতি হানা দিয়ে ফেরে,—কিষাণেরা, মালগাড়ী, এঞ্জিনীয়ার…! ওটচারা দেখবার জন্য মাশা আর আমি গাড়ী ক'রে মাঠে যাই। মাশা চালায় গাড়ী, আমি ব'সে থাকি তারই পেছনে। হাওয়া এসে খেলা করে তার চুলে চুলে।

"হটিয়ে, হটিয়ে!"—পথের লোককে সে সাবধান ক'রে দেয়। "তুমি কিন্তু ঠিক শ্লেজচালকের মতোই!"—তাকে বললাম আমি। "হ্যাঁ ঠিক,—আমার ঠাকুর্দা, মানে বাবার বাবাই ছিলেন শ্লেজচালক। বাঃ রে, জানোনা তুমি? আমার দিকে ফিরে মাশা বললো এবং সংগে

সংগে সে শ্লেজচালকের মতোই হাঁক দিয়ে গান ধরলো; বিদ্রূপের স্বরে! "বেশ, বেশ!"—তার গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম—"ভালোই যা হোক!"

আবার সেই স্মৃতি কিষাণ,—মালগাড়ী—এঞ্জিনীয়ার .....

(তেরো)

ডাক্তার ব্লাগোভো সাইকেলে এসে উপস্থিত হ'ল, আমার বোনও যাওয়া-আসা সুরু করলো আবার। আবার আলোচনা আরম্ভ হ'ল—শারীরিক শ্রম, প্রগতি, ভবিষ্য-মানবের প্রতীক্ষা ইত্যাদি কত বিষয়। আমাদের কৃষিকাজ পছন্দ করে না ডাক্তার। তার মতে লাঙলঠেলা, ফসলকাটা, গোচারণ,—এই সব কাজ যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষেই অমর্যাদাকর! জীবনের এই স্থূল যুদ্ধ, জীবিকাযুদ্ধ মানুষ একে একে চাপাবে পশুর আর যন্ত্রের ঘাড়ে,—মানুষ নিয়োজিত হবে বৈজ্ঞানিক সন্ধানে। আমার বোন সকাল সকাল বাড়ী ফিরবার জন্যে মিনতি করছিল বারবার,—সে যদি রাত ক'রে বাড়ী ফেরে বা আমার এখানে রাতটাই থেকে যায় তো হৈচৈ-র সীমা থাকবে না!

"হায় ভগবান! তুমি কি কচি খুকীটি এখনো!"—ভৎর্সনা করছিল মাশা—"কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

"সত্যিই,"—আমার বোনও সায় দিল—"আমিও বুঝি যে এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু না পেরে উঠলে কী করবো বলো? সব সময়েই মনে হয়, এই বুঝি অন্যায় করলাম।"

খড়ের গাদা করার সময় অনভ্যস্ত শ্রমে সারা গা আমার ব্যথা হয়ে উঠলো। সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় ব'সে লোকজনের সমুখে কথা বলতে বলতে কখন যে ঝিমিয়ে পড়ি, আর তারা সবাই হেসে ওঠে, আমাকে জাগিয়ে

তুলে খেতে বসে। ঝিমানো নেশায় আমার চোখের সামনে তখনো ভাসতে থাকে—আলোর মালা, মানুষের মুখ, প্লেটের সারি। সবই যেন স্বপ্ন! কানে সবই শুনি, কিন্তু মাথায় ঢোকে না। খুব ভোরে উঠে কাস্তে নিয়ে কাজে লেগে যাই, অথবা দালানের ওখানে মিস্ত্রীর কাজ করতে থাকি সারাদিন।

ছুটির দিনে বাড়ী থাকলে লক্ষ্য করি, আমার বোন ও মাশা কি যেন লুকিয়ে ফিরছে আমার কাছ থেকে, এমন কি আমাকেই এড়িয়ে চলছে! মাশা অবশ্যি আমার উপর আগের মতোই দরদী কিন্তু তার নিজস্ব একটা ভাবনা আছে আজকাল। কিষাণদেব উপরে তার বিরক্তি দিন দিনই বেড়ে উঠছে, তার বর্তমান জীবনধারা দিন দিনই হয়ে উঠেছে বিশ্রী বিরস, তবু সে আমার কাছে মুখ ফুটে একটা কথা বলে না। আজ কাল আমাব চেয়ে বরং ডাক্তারের সংগে সে স্বেচ্ছায় কথা বলে। তার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারি না।

আমাদের অঞ্চলে একটা প্রথা ছিল। ফসলকাটা উপলক্ষে মজুরেরা সন্ধ্যাবেলা ভোদকা নিয়ে জ'মে বসে, এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত দু-এক গ্লাস খেয়ে ফেলে। এই প্রথা মানিনি আমরা। কিষাণ মেয়েরা ও ধানকাটা মজুরেরা এসে ভিড় করে আঙিনায়, ভোদকার প্রতীক্ষায় রাত পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে গালাগাল দিতে দিতে বাড়ী ফেরে। মাশা দেখে শুনে ভ্রূকুটি করতে থাকে, একটা কথাও বলে না। ডাক্তারের কাছে শুধু বিদ্বেষবশে বিড়বিড় ক'রে বলে—"বর্বর জানোয়ারের দল, শয়তানের দল!"

দেশগাঁয়ে নতুন মানুষদের লোকে দেখে বক্রচোখে, দেখে শত্রুর মতো। স্কুলেও ঠিক তাই। আমাদেরও অভ্যর্থনা হ'ল সেই রকমই। প্রথমে তারা আমাদের মনে করে বোকা,—নইলে টাকা দিয়ে এমন

বাজে জায়গা কিনি! আমাদের ঠাট্টা করে তারা। কিষাণরা এসে গরু চরায় আমাদের বাগানে, এমন কি আমাদের আঙিনায়। আমাদের গরু-ঘোড়া তাদের মাঠের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে তারা নিজেরাই এসে আবার টাকা দাবী করে,—ফসল নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ চাই! কিষাণেরা জোট পাকিয়ে আমাদের আঙিনায় ঢুকে প'ড়ে গলা ফাটিয়ে কৈফিয়ৎ চায়,—অন্যের জমিতে কেন আমরা হাল চালিয়েছি? জমি-জমার সীমানা ঠিক ঠিক জানি না ব'লে তাদের কথাই সত্যি মনে ক'রে ক্ষতিপূরণ দিই। পরেই অবশ্যি ধরা পড়ে সীমানা নিয়ে কোনই ভুল হয়নি। একটা কিষাণ,—লোকটাও আস্তো শকুন,—লাইসেন্স নেই তার, গোপনে গোপনে সে ভোদকার ব্যবসা করে, আমাদের মজুরদের ঘুষের জোরে হাতে এনে আমাদের সংগেই করে বিশ্বাস-ঘাতকতা। গাড়ী থেকে নতুন চাকা খুলে নিয়ে লাগিয়ে রাখে পুরোনোগুলি, চাষের সাজসরঞ্জাম চুরি করে এবং ঠিক সেগুলিই আবার বিক্রী করে আমাদের কাছে! এমনি সব কাণ্ড। সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হ'ল স্কুলবাড়ী নিয়ে। কিষাণ মেয়েরা রাতে এসে চুরি ক'রে নেয় তক্তা, ইঁট, টালি বা বিম। গাঁয়ের মোড়ল জনকয়েক অনুচর নিয়ে ঘরে ঘরে খোঁজখবর করে,—গ্রাম্যসমিতি প্রত্যেককেই জরিমানা করে দু' দু' রুবল, এবং টাকাটা তুলে তা দিয়েই আবার মদ খায় সবাইমিলে!

মাশা শুনে তো রেগেই আগুন! ডাক্তার ও আমার বোনের কাছে সে গশগশ করতে থাকে—

"জঘন্য পশুর দল! কী সাংঘাতিক, ওঃ কী সাংঘাতিক!"

অনেকবারই আমি তাকে আফশোষ করতে শুনি—"স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কী ভুলই যে করেছি।"

"কিন্তু বুঝে দেখুন,"—ডাক্তার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—"আপনি যদি এই স্কুলপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্বসাধারণের ভালো করেন—সে তো শুধু কিষাণদের জন্যেই নয়,—সে হ'ল শিক্ষাসংস্কৃতির নামে, ভবিষ্যের উদ্দেশে। কিষাণরা যতই হীন ও জঘন্য হবে স্কুলপ্রতিষ্ঠার কারণও হবে ততই মুখ্য, বুঝতে পারছেন ?"

কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে নেই বিশ্বাসের জোর। আমাব মনে হ'ল, সে ও মাশা দুজনেই ঘৃণা করে কিষাণদের।

মাশা প্রায়ই আমার বোনকে নিয়ে 'মিলে' আসতো। হাস্তে হাস্তে দুজনেই বলতো—স্তেপানকে দেখতে যাচ্ছে তারা। কেমন সুন্দর মানুষ সে! স্তেপান লোকটি পুরুষজাতির কাছে বেরসিক হ'লেও মেয়েদের মধ্যে তারই চালচলন হয়ে ওঠে প্রাণখোলো, কথা বলে সে কলস্রোতের মতো! নদীতে স্নান করতে যাবার পথে একদিন হঠাৎ কাদের চাপা কথাবার্তা শুনতে পেলাম। মাশা ও ক্লিওপাত্রা দুজনেই শোভন সুন্দর সাদা পোষাক প'রে ব'সে আছে নদীর পারে,—একটা উইলো গাছের বিস্তৃত ছায়ায়। স্তেপান তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে, হাত দুটি পেছনে ঘুরিয়ে ধরা। সে বলছিল :—

"কিষাণরা আবার মানুষ নাকি? মানুষ নয়,—কিছু মনে না করলে বলি, ওরা হ'ল বর্বর, জানোয়ার, জঘন্য কতোগুলো শয়তান। কিষাণদের জীবনে আছে কী? কিছু না! পেট ভ'রে খাওয়া আর মদে ডুবে থাকা। কিষাণের একমাত্র ভাবনা হ'ল—ডালরুটী শস্তা হ'ল কি না; আর একমাত্র কাজ হ'ল শুঁড়িখানায় ব'সে গুণ্ডার মতো শুধু মদ গেলা! নেই কোনো আলাপ-আলোচনা, নেই আদব কায়দা, নেই ভদ্রতাজ্ঞান। আছে কি? আছে বোকামি আর বোকামি! নোংরা আবর্জনাস্তূপের মধ্যে সে থাকে, থাকে তার বৌ, থাকে তার চৌদ্দপুরুষ। যার

উপরে সে পা মোছে, ঘুমোয়ও আবার তার উপরেই; খায় হাত না ধুয়েই, মদ গেলে আরসোলা শুদ্ধু,—এমন কি সেটাকে তুলে ফেলবার জন্যও মাথাব্যথা নেই!"

"সে সব কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যেই!"—আমার বোন মাঝখানে বাধা দেয়।

"দারিদ্র্য? অভাব আছে এবং থাকবে—তা ঠিকই, নানা রকমের অভাব। কিন্তু দেখুন, কেউ যদি আটক থাকে জেলে বা ভগবান না করুন, খোঁড়া হয়েই প'ড়ে থাকে, সে তো খুব দুর্ভাগ্যের কথাই। কিন্তু, কারো হাত পা যদি খোলাই থাকে, ইন্দ্রিয় থাকে সতেজ, থাকে চোখ কান হাত পা, থাকে নিজের শক্তি, আর ভগবান থাকেন এই মাথার উপরে—তবে—তবে কি চাই আর? দেখুন, আসলে এ সবের মূল কথা হ'ল দারিদ্র্য নয়,—বোকামি, বোকামি আর বোকামি! এই ধরুণ, আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যদি সহানুভূতিবশে তাদের সাহায্য করতে যান তো দেখবেন, তারা নিজেরাই কী জঘন্যভাবে কী নীচভাবে পকেট মারবে আপনাদের, বা আরো দুঃখের কথা, সে টাকা দিয়ে হয়তো মদের দোকানই খুলে বসবে একটা এবং আপনার টাকার জোরেই পরের মাথা ভাঙতে লেগে যাবে! আপনি বলেন দারিদ্র্য? কিন্তু ধনী কিষাণরাই ভদ্রভাবে থাকে কি? তবেই দেখুন না? নির্বিবাদে সেও থাকে ঠিক জানোয়ারের মতোই, শূয়োরের মতোই। স্থূল, জঘন্য, নোংরা-ঘাঁটানো, কাদা-ঘাঁটানো জানোয়ারের দল। ইচ্ছে হয়, এক ঘুষিতেই দিই ঠিক ক'রে, শয়তানেরা! ধরুণ না, দ্যুবেত্‌স্নিয়ার এই লেরিয়নকে। সে খুব ধনী তো, কিন্তু গরীবদের মতোই সেও আপনার গাদার খড় চুরি করে। আর, কী অশ্লীল মুখ তার,—ছেলেটাও বাপকা বেটা! কখনো যদি খুব মদ গেলে তো,

কাদার মধ্যেই নাক ঘষতে ঘষতে ঘুমিয়ে থাকে সেখানে! দেখুন, ওরা ঝাড়ে-মূলেই অপদার্থের দল! বাঁশের গোড়া দিয়ে বাঁশই গজায় তো! ওদের মধ্যে থাকা না তো নরকবাস! আমার কথা ধরলে,—খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, নিজে ছিলাম একদিন অশ্বারোহী সৈন্য, তিন তিনবার হয়েছি গাঁয়ের মোড়ল! এখন আমি স্বাধীন কসাকের মতো,—থাকি যেখানে খুশি। গাঁয়ে ভালো লাগে না আমার, জোর ক'রে কেউ বেঁধে রাখতেও পারে না আমাকে। সবাই বলে আমার স্ত্রীর কথা। স্ত্রীকে নিয়ে আমি নাকি ঘর করতে বাধ্য। কিন্তু কেন? আমি তার ভাড়াকরা লোক নয়।"

"আচ্ছা স্তেপান, তুমি কি প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছো?"—মাশা জিজ্ঞেস করলো।

"গাঁয়ে আবার প্রেমে পড়া?"—স্তেপান হেসে ওঠে। "খাঁটি কথা বললে এই হ'ল আমার দ্বিতীয় বিয়ে। আমি কুরিলোভ্‌কার লোক নই, জেলেগোসচো থেকেই এসেছি। তবে বিয়ের পর থেকেই আছি এই কুরিলোভ্‌কায়। তারপর শুনুন, বাবা তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করতে চাইলেন না। আমরা পাঁচ ভাই ছিলাম কিনা! কাজেই, বাবাকে নমস্কার জানিয়ে স্ত্রীর সংসার উঠিয়ে নিয়ে এলাম অন্য গাঁয়ে। কিন্তু, আমার প্রথম স্ত্রী মারা যায় খুব কম বয়সেই।"

"কিসে মারা গেলো?

"বোকামিতে, আর কিসে? কোনো কারণ নেই, অথচ দিনরাত কাঁদতে কাঁদতে একদিন শেষে ম'রেই গেলো! সুন্দর হবার সখে সবসময়েই সে গাছের শেকড় বা মূল খেতো, তার ফলেই বোধ হয় ভেতরটা প'চে গিয়েছিল। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী কুরিলোভ্‌কার,—আস্তো একটা গর্দভ। গেঁয়ো কিষাণ-মেয়ে! ব্যস্, এই হ'ল তার সমগ্র পরিচয়।

সম্বন্ধ হবার সময় আমাকে তারা একেবারে হাত ক'রে ফেলেছিল। আমি ভাবলাম, মেয়েটির রং ফর্সা, বয়সও কম, থাকেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দ কি! তার মা-টিও বেশ মানুষ, কাফি খায় খুব। আসল কথা হচ্ছে, নিজেদের ধরণেই ফিটফাট তারা। কাজেই, করলাম বিয়ে। বিয়ের পরদিন খেতে বসেছি, শাশুড়ীকে বললাম একটা চামচে দিতে। সেও একটা চামচে এনে দিলো, তবে লক্ষ্য করছিলাম যে সে হাতের আঙুলেই মুছে দিলো সেটা! ভাবলাম—তা' হ'লে এই তো! বেশ পরিষ্কারই বটে! এক সংগে ছিলাম পুরো এক বছর, তারপরেই চ'লে এলাম। এখন শহর থেকে একটা মেয়ে বিয়ে করলে মন্দ হয় না।" একটুকাল থেমে বললো সে—"লোকে বলে, স্ত্রী হচ্ছে সংগিনী, সাহায্যকারিণী! কিন্তু সাহায্যকারিণী দিয়ে কি হবে আমার? নিজেই করতে পারি সব। বরং আমি চাই, সে একটু কথাবার্তা বলবে মিঠে গলায়,—দিনরাত শুধু খচ্ খচ্ করবে না। সুন্দর আলাপ-সালাপ শুনতে না পেলে জীবনটাই ব্যর্থ!"

হঠাৎ থেমে যায় সে এবং সংগেসংগেই সুরু হয় তার একটানা বিশ্রাম গুঞ্জন,—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ······! তার মানে, আমাকে দেখতে পেয়েছে সে।

প্রায়ই 'মিলে' যায় মাশা। স্পষ্টতই, স্তেপানের সংগে কথা ব'লে আরাম পায় সে। স্তেপান কিষাণদের গালিগালাজ করে এত জোরালো বিশ্বাসে, এত সহজ সুরে যে, মাশা স্তেপানের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

মিল থেকে ফিরবার পথে বাগানের মালীটা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—"এই মাগী, মাগী!"—আর সংগে সংগে শব্দ করে কুকুরের মতো!

মাশাও তার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে,—ঐ বোকা চাষাটার

উক্তির মধ্যেই সে যেন খুঁজে পায় তার আপন প্রশ্নের উত্তর, স্তেপানের ভর্ৎসনার মতোই ভালো লাগে তার। বাড়ীতে এসে যথারীতি কয়েকটা খবর পায় সে। যথা, বাগানের বাঁধাকপি নষ্ট করেছে গাঁয়ের একদল হাঁস, লেরিয়ন চুরি করেছে গরুর দড়ি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে মাশার ভুরু কুঁচকে ওঠে—"আচ্ছা, এমনি সব লোকের কাছ থেকে কী আশা করতে পারো তুমি?"

রাগে সে গশ গশ করতে থাকে, বুকের মধ্যে যেন জ্বালা হয় তার। আর এদিকে, দিনদিন আমি এক হয়ে যাচ্ছি এই কিষাণদেব সংগেই। অধিকাংশ কিষাণেরাই হ'ল দুর্বল ও বদমেজাজী,—অধঃপতিত জনগণ। মন তাদের স্থবির হয়ে গেছে, মূর্খ তারা। তাদের ধারণায় জীবনটা হ'ল ক্লেদাক্ত, ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত, একঘেয়ে একটানা, শ্রীহীন নীরস। সেই একঘেয়ে ধূসর মাটি, নিষ্প্রভ ধূসর দিন, পোড়া পচা রুটি, বদমায়েশি, ভণ্ডামি আর ঠকামি। বিশ রুবল দিলেও তারা জমি চষতে আসবে না, কিন্তু আধ কলসী ভোদকার লোভেই ছুটে আসবে। আসলে কিন্তু বিশ রুবল দামেই মদ পাওয়া যায় চার চার কলসী। সত্যিই, এদের মধ্যে আছে নোংরামি, মাৎলামি, আছে বোকামি আর শঠতা; কিন্তু সব সত্বেও একথা ঠিক যে এদের জীবনই দাঁড়িয়ে আছে খাঁটি এক দৃঢ় ভিত্তির উপর। কিষাণ যখন মাঠে লাঙল ঠেলে, তাকে যতই অসভ্য বুনোর মতো মনে হ'ক না,—ভোদকার গুণে সে যতই বোকা ব'নে যাক না—তবু, তবু আরো তলিয়ে দেখলে ধরা পড়বে যে তার মধ্যেই জাগ্রত হয়ে আছে একটি জাতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—মাশা বা আমাদের ডাক্তারের মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া ভার। তাদের সহজাত বিশ্বাস, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হ'ল সত্য ও সততা, তাদের নিজের মুক্তিও রয়েছে ঐ সত্য ও সততার

মধ্যেই। তাই সবচেয়ে ভালোবাসে তারা খাঁটি ব্যবহার। আমার স্ত্রীকে বললাম, সে চাঁদের কলঙ্কই দেখেছে মাত্র, চাঁদ দেখতে পায়নি! কিন্তু কোনোই জবাব দিল না সে, স্তেপানের মতো শুধু গুন্ গুন্ করতে লাগলো—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ। যখন এই বুদ্ধিমতী মেয়েটি রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিষাণদের মাতলামি ও অসাধুতার কথা ডাক্তারের কাছে বর্ণনা করতে থাকে,—তখন আমি তার বিস্মৃত হবার শক্তি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যাই! কী ক'রে সে ভুলে যায় যে তাদের এই দ্যুবেত্স্নিয়া কিনবার টাকার পেছনেই খাড়া হয়ে আছে কত যে নির্লজ্জ ও উদ্ধত অসাধুতার জীবন্ত ইতিহাস! কী ক'রে সে ভুলে যায় এসব?

(চৌদ্দ)

আমার বোনও যেন আমার কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে তার নিজের জীবনকে। প্রায় সময়ই সে মাশার সংগে চুপি চুপি আলোচনা করে। কাছে গেলে সে যেন গুটিয়ে বসে নিজের মধ্যে, চোখেমুখে ফুটে ওঠে অপরাধী দৃষ্টি! নিশ্চিতই তার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য সে ভীত বা লজ্জিত। তাই সব সময়েই সে মাশার কাছে কাছে থাকে। ভয় হয়, কখন আবার একা আমার মুখোমুখি এসে পড়ে! খাবার সময় ছাড়া তার সংগে কথা বলার সুযোগই হয় না বড় একটা।

একদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুলবাড়ী থেকে ফিরতি পথে বাগানটা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার বোন ঝাঁকড়া একটা আপেল গাছের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছিল—ঠিক ছায়ার মতোই। আমাকে সে দেখতে পায়নি, আমার পায়ের

শব্দ শুনতে পায়নি। কালো একটা পোষাক তার গায়ে। মাটির দিকে চেয়ে একই পথে বারবার সে পায়চারি করছিল। হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়তেই চমকে উঠলো সে,—হাত দিয়ে দুটি গাল চেপে ধরলো আঁৎকে ওঠার ভঙ্গীতে! সেই মুহূর্তেই আমি তার কাছে এগিয়ে এলাম। হঠাৎ আমার সারা বুক জুড়ে উথলে উঠলো নরম একটি আদর, চোখে এল জল। মনে পড়লো আমার মাকে। মনে পড়লো আমার সেই ছোটবেলা! আমার মা-মরা এই বোনকে আমি গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—"কি হয়েছে তোমার! অনেকদিন থেকেই অসুখী দেখছি তোমাকে। বলো, কি হয়েছে তোমার?"

"ভয় করছে আমার!"—কাঁপছিল সে।

"তোমার হাত দুটি ধ'রে বলছি, বলো বোনটি, কি হয়েছে তোমার?"

"খুলেই বলবো আমি, তোমাকে সবকিছুই বলবো আজ। তোমাকে লুকিয়ে ফিরতে এত ব্যথা লাগে আমার। মিজেইল, আমি ভালোবাসি……" সে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে বলতে লাগলো—"আমি ওকে ভালোবাসি, সারা বুক দিয়ে ভালোবাসি…… সেই আমার সুখ… কিন্তু এত ভয় হয় কেন আমার?"

শোনা গেল পায়ের শব্দ; গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ডাক্তার ব্লাগোভাকে। গায়ে সিল্কসার্ট, পায়ে বুট। স্পষ্টতই, এরা দুজনে আপেল গাছের কাছে দেখা করা ঠিক করেছিল। তাঁকে দেখতে পেয়েই আমার বোন ডাকতে ডাকতে পাগলের মতো ছুটে গেল;—তার ব্লাগোভোর কাছ থেকে কেউ যেন তাকে ছিনিয়ে নেবে!—

"ভ্লাদিমির, ভ্লাদিমির আমার!"

সে ডাক্তারের বুকে লেগে রইলো, তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো

তৃষিতের মতো। এই প্রথমবার আমার চোখে পড়লো, আমার বোন এই কয়েকদিনের মধ্যেই কত শুকিয়ে গেছে! তার গলার লেসকলারটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে! ডাক্তার প্রথমে আমাকে দেখে একটু চমকে উঠলো, কিন্তু তখনি আবার সামলে নিয়ে ক্লিওপাত্রার মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলো ;—

"কি হয়েছে······এত ভয় হচ্ছে কেন? এই তো আমি!"

বিব্রতভাবে আমরা মুখ চাওয়া চায়ি করি। কিছুক্ষণ পরে আমরা তিনজনে হাঁটতে লাগলাম। ডাক্তার ব'লে যাচ্ছিল—

"দেখুন, আসলে আমাদের মধ্যে এখনও সুরু হয়নি সংস্কৃত জীবন। বৃদ্ধেরা এই ব'লে সান্ত্বনা পেতে চান যে, আজ কিছু নেই বটে,—একদিন ছিল তো সবই!—এই হ'ল বৃদ্ধের দল! আপনি আমি যুবক, আমাদের পেয়ে বসেনি অতীতের মোহ, এই সব মিথ্যা মরীচিকা দিয়ে আমরা নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে পারি না। রাশিয়ার সুরু হয়েছে ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু সভ্য রাশিয়া এখনও অনাগত!"

কিন্তু এই সব বক্তৃতার কী যে অর্থ মাথায়ই ঢুকলো না আমার। আমার বোনের প্রেমে পড়া, একজন অপরিচিতের হাত ধ'রে থাকা, দরদভরে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা—কেন যেন এই সবকিছুই আমার কাছে ঠেকছিল একেবারেই রহস্যময়। যেন বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না! ভীরু দুর্বল ডানাভাঙা এই বন্দিনী পাখীটি,—সেই আবার ভালোবাসে একটি বিবাহিত লোককে—যার নিজেরই ছেলেমেয়ে রয়েছে কয়েকটি! কেন যেন খুবই দুঃখ হ'ল আমার। তার যথার্থ কারণ কি বলতে পারবো না। যে কারণেই হ'ক, ডাক্তারের উপস্থিতি আমার কাছে একান্তই অপ্রীতিকর মনে হ'তে লাগলো। এই প্রেমের কোথায় যে পরিণতি হবে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

(পনেরো)

মাশা আর আমি চললাম কুরিলোভকায়। আজ স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। "শরৎ শরৎ......আব শরৎ"—বারবার মাশা বলছিল, দৃষ্টি তার বহু দূরে। ফুরিয়ে গেল সুন্দর বসন্ত, পাখীরা আজ উধাও, একমাত্র উইলো গাছ ছাড়া কোথায়ও আর সবুজের ছায়াটুকুও চোখে পড়ে না।

হ্যাঁ, বসন্ত শেষ হয়েছে,—সেই উষ্ণ-উজ্জ্বল দিনগুলি। কিন্তু ভোরেব আবহাওয়া এখনো তাজা, রাখাল ছেলেরা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে ভেড়ার লোমের পোষাক প'রে, আস্তার গাছের পাতাগুলি সারাদিনই থাকে শিশির-ভেজা! সব সময়েই শোনা যায় এক একটা বেদনার্ত্ত ধ্বনি,—বোধহয় সারসের ডাক! শুনেই হালকা হয়ে ওঠে প্রাণ, নতুন ক'রে জেগে ওঠে বাঁচবার সাধ!

"বসন্ত ফুরালো!"—মাশা বললো,—"এখন একবার আমরা অতীতের হিসেব নিকেষ ক'রে নেই এসো! অনেক কাজ তো করলাম. ভাবলামও খুবই। ভালোই হ'ল,—আত্মোন্নতি তো হয়েছে! কিন্তু আমাদের নিজেদের সাফল্য কি চারপাশের জীবনধারায় কোনো পরিবর্তন এনেছে, একটী লোকেরও কোনো উপকার হয়েছে কি? না কিছু না মূর্খতা, অপরিচ্ছন্নতা, মাৎলামি, সাংঘাতিক শিশুমৃত্যু—সবকিছুরই যাত্রা সেই গতানুগতিক ধারায় চলেছে। তুমি যে এই চাষবাস করলে,—আমি যে খরচ করলাম রাশি রাশি টাকা, পড়লাম এত বই—সেজন্যে একটি লোকের জীবনও তো উন্নত হয়নি একটুও! স্পষ্টতই, নিজের জন্যেই খেটেছি আমরা, আমাদের উন্নত চিন্তাধারা

আমাদেরই শুধু!" এমন সব যুক্তিতে আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম, কী যে বলবো কিছুই বুঝলাম না।

"কিন্তু প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত খাঁটিই রয়েছি আমরা।"—আমি বললাম—"কেউ যদি খাঁটি থাকে তো ভুল করেনি সে।"

"তা' বলে কে? কিন্তু যা নিয়ে খাঁটি তাইতো প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। যে নিয়মে আমরা চলেছি সেটার গেড়াতেই গলদ। জনসেবায় লেগেছো তুমি, অথচ তোমার এই জমিদারী কেনাটাই মস্ত এক মারাত্মক ভুল,—তাদের জন্য কিছু যে করবে তার সম্ভাবনা পর্যন্ত স্বরুতেই তুমি নষ্ট ক'রে দিয়েছো। বলবে, তুমি খাও পরো কিষাণের মতো। তার মানে, তোমার কৃতিত্ব, তোমার আধিপাত্য বলেই 'তুমি যেন সমর্থন ক'রে নিয়েছ তাদের নোংরা বিদঘুটে পোষাক, জঘন্য বাসস্থান, তাদের ছাগলের মতো দাড়ি।······তারপর, আর একদিক থেকেও দেখো। ধরো, তুমি বছরের পর বছর কাজ ক'রে গেলে আমরণ,—কিন্তু তোমার সে সাফল্য কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ। দেশব্যাপী এই যে মূর্খতা, বুভুক্ষা, শীতের অত্যাচার, এই যে নৈতিক অবনতি—বিরাট এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কী করতে পারো তুমি, কতটুকু পারো? সমুদ্রের জলবিন্দু সে। জীবনযুদ্ধের অস্ত্র হওয়া দরকার আরো শক্তি-দৃঢ়, আরো সাহস-দীপ্ত, আরো বেগোন্নত। সত্যিই যদি কেউ কাজ করতে চায় তাকে এইসব সামাজিক কাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে নামতে হবে অসংখ্য জনগণেব মধ্যে। সর্বাগ্রেই দরকার হচ্ছে সর্বসাধারণের কাছে শক্তিমান এক আবেদন। সেই আবেদন হবে সংগীতের মতো সর্বব্যাপী ও জীবন্ত-জাগ্রত, হবে জনপ্রিয়, কারণ সংগীত-শিল্পীর আবেদন পৌছায় গিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণমূলে! অপূর্ব, অপূর্ব এই শিল্পমহিমা!"—আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের মতো বলতে

লাগলো সে—"সংগীত আমার জীবনে মেলে দেয় নতুন ডানা, উড়িয়ে নিয়ে চলে দূর থেকে দূরান্তরে! জীবনের নোংরামি, ব্যবসাদারি বা অর্থের অনর্থ নিয়ে যারা ক্লান্ত বিরক্ত,—তারা অপূর্ব শান্তি ও গভীর তৃপ্তি পায় এই সুন্দরের রাজ্যে।"

কুরিলোভকায় পৌঁছে দেখলাম চারদিকের প্রকৃতিই আনন্দে উজ্জ্বল। কোথাও শস্য মাড়ানো হচ্ছে, রাইখড়ের গন্ধ আসছে হাওয়ায় হাওয়ায়, বাগানের পাঁচিলের পেছনে পাহাড়ের গায়ের ঝোপটা দেখাচ্ছে টকটকে লাল, চারদিকের সব গাছপালার রঙ কেমন লালচে সোনালি! মা মেরীর মূর্তি স্কুলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে গান—"পুণ্যময়ী মেরী মা বিপদবারিণী!" হালকা হাওয়া বইছে, মাথার উপরে উড়ে ফিরছে ঘুঘুর দল।

অনুষ্ঠান সুরু হবে ক্লাশঘরে। কুরিলোভকার কিষাণরা দেবীমূর্তিটি এনে মাশাকে দান করলো, ত্র্যবেত্‌স্কিয়ার কিষাণেরা উপহার দিল মস্ত বড় একটা রুটি ও একশ' বাক্স নোনতা খাবার! আর মাশাও হঠাৎ কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

"ভুলে যদি অনুচিত কিছু ব'লে থাকি—" এক বুড়ো উঠে বললো—"বা আমাদের ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে কিছু ক'রে থাকি তো আমাদের ক্ষমা করুন!" মাশার ও আমার দিকে তাকিয়ে সে মাথা নোয়ায়।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে মাশা গাড়ী থেকে তাকাতে লাগলো স্কুলের চারদিকে। বহুক্ষণ পর্যন্ত দেখা যেতে লাগলো আমার হাতে রঙ-করা স্কুলের সবুজ ছাদ, ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদে! মনে হ'ল, মাশার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে আসন্ন বিদায়ের ছবি!

(ষোলো)

সন্ধ্যেবেলায় মাশা যাবার জন্যে তৈরী হ'ল। কিছুদিন থেকে প্রায়ই সে শহরে যায়, রাতেও থাকে সেখানে। কিন্তু, সে আমার কাছে না থাকলে কোনো কাজেই মন বসে না, শিথিল হয়ে আসে দুর্বল হাত। আমাদের মস্ত বড় আঙিনাটা মনে হয় শূন্য এক বিরাট গহ্বর! বাগানের মধ্যে মারামারি হট্টগোল, আর এদিকে তাকে ছাড়া সবই মনে হয় বিভূঁই বিদেশের মতো।

মাশার টেবিলে ব'সে রইলাম তার বইএর শেলফের পাশে। তার কৃষিগ্রন্থালয়ের বইগুলি—সেই পুরোনো বইগুলি আজ প'ড়ে আছে লজ্জিত মুখে, অনাদৃতের মতো। তার পুরানো প্রিয়-পরিচিত দস্তানাটা, হাতের কলমটি বা ছোট কাঁচিখানা হাতে নিয়ে দেখতে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় নির্বাক নীরবে। বেজে যায় সাতটা আটটা নটা। বাইরে ঘনিয়ে আসে শরৎ-রাত্রি—কালির মতো কালো! শুধু ব'সে আছি। আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমি যা কিছু আগে বলেছি, যা কিছু করেছি—আমার চাষবাস, মিস্ত্রীর কাজ—সবকিছুর পেছনেই রয়েছে মাশা! সে যদি এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা নোংরা কুয়োও সাফ করতে বলতো—আমি বোধহয় তক্ষুনি তাই করতাম, একবার ভাবতামও না সেই পরিশ্রমের সার্থকতার কথা। আজ সে কাছে নেই,—তাই এই দ্যুবেত্‌স্নিয়া-এর ধ্বংসস্তূপ, এর কদর্যতা, এর বাসিন্দা যত চোর ডাকাতের দল—সব মিলে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা—প্রকাণ্ড একটা ব্যর্থতার রাজ্য! তা' ছাড়া আমার কি কাজ রয়েছে এখানে, দিনরাত কেন আমার এই দুশ্চিন্তা! মনে হয়, আমার পায়ের তলা থেকে যেন স'রে যায় মাটি, স'রে যায়

দ্যুবেত্স্নিয়া, মুছে যায় আমার জীবন, অর্থহীন কৃষিগ্রন্থগুলির মতোই প'ড়ে থাকে আমার পরিত্যক্ত ভাগ্য। হায় হায়, শুব্ধ রাতে সে কী দুঃসহ জীবন আমার, প্রতিটি মুহূর্ত শঙ্কায় কেঁপে উঠছে আমার বুকের ভেতর। কেউ যেন এক্ষুণি আদেশ ক'রে বলবে, এক্ষুণি আমাকে দ্যুবেত্স্নিয়া ছেড়ে যেতে হবে। দ্যুবেত্স্নিয়ার জন্যে দুঃখ হয় না আমার, দুঃখ হয় আমার ভালোবাসার জন্যে। কাছেই ঘনিয়ে এসেছে তার হিমার্ত অবসান। ভালোবাসতে পারা ও ভালোবাসা পাওয়া যে জীবনের পরম ভাগ্য! আর এই সুখস্বর্গ থেকে নির্বাসনও কী ভয়ানক!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শহর থেকে ফিরে এল মাশা, কোনো কারণে সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সে ভাবটা ঢেকে রেখে সে শুধু বললো, "শীতের ভয়ে এক্ষুণি সব জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছো! বাব্বাঃ, দমই আটকে আসছে যে!" খুলে দিলাম জানলা, ক্ষিদে পায়নি, খেতে এলাম তবু।

"যাও, হাত ধুয়ে এসো গে!"—স্ত্রী বলছিল—"তোমার হাত থেকে রঙের গন্ধ আসছে।"

শহর থেকে কতগুলি মাসিক পত্রিকা নিয়ে এসেছে মাশা। খাওয়ার পর দু'জনে মিলে সেগুলি দেখতে লাগলাম,—নতুন ফ্যাশানের অনেক পোষাকের নমুনা ছিল সেখানে। মাশা পাতা ওলটাতে ওলটাতে সেটাকে রেখে দিচ্ছিল, পরে আবার দেখবে ভালো ক'রে! কিন্তু নতুন একটা পোষাক তার চোখে ভালো লাগতে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে সে বললো—

'মন্দ নয় এটা!'

"সত্যিই, এ পোষাকে মানাবে তোমাকে চমৎকার, সত্যি চমৎকার!"

আবেগভরে দেখতে লাগলাম পোষাকটা, বারবার প্রশংসা করলাম তার ধূসর রঙটা। মাশার ভালো লেগেছে ব'লেই প্রশংসা করতে লাগলাম দরদের সুরে।

"চমৎকার, সত্যি ভারী সুন্দর পোষাক, সত্যি সুন্দর, মাশা, আমার মাশা!" আর চোখের জল পড়তে লাগলো পত্রিকার সেই ছবির উপর। ফিস ফিস ক'রে বলছিলাম—"আমার মাশা, এমন ভালো তুমি, তুমি এমন সুন্দর!"

বিছানায় শুতে গেল সে, আমি আরো ঘণ্টা খানেক ব'সে ছবি দেখলাম। "অবাক করলে, তুমি জানলাটা আবার খুলে দিতে গেলে কেন?"—শোবার ঘর থেকে মাশা বললো, "ঠাণ্ডা লাগবে ভয় হচ্ছে।"

পত্রিকার 'বিচিত্র বার্তা' থেকে পড়লাম কিছু কিছু, পড়লাম শস্তায় কালি বানানোর পদ্ধতি, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরার ইতিহাস; পাতা উল্টে পাল্টে আবার এলাম পোষাকের সেই মাশার প্রিয় পাতায়। আমি মনে মনে আঁকলাম মাশার রূপ,—হাতে ব্যাগ, নির্মল নিটোল তার নগ্ন গ্রীবাটি, কী মর্যাদাময় তার চেহারাটুকু! তার মধ্যে যেন জাগ্রত হয়ে আছে চিত্র, সংগীত ও সাহিত্যের স্বপ্নলোক,—সমস্ত কারুশিল্পের সমারোহ! তার পাশে আমি কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ!

আমার সংগে দেখাশোনা ও আমাদের পরিণয় এই গুণবতী নারী মাশার বহুবিচিত্র জীবনের একটি অধ্যায়মাত্র, তার জীবন দিনে দিনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে নব নব বৈচিত্র্যে। দুনিয়ার সবকিছুই যেন বিনা আয়াসেই বাঁধা থাকে তার দুয়ারে! এমন কি আদর্শ জীবনধারা বা তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রকাশও তার কাছে চিত্তবিনোদন মাত্র—জীবন-নাট্যের এক একটি অংশ মাত্র! "আমি নিজে যেন একটা গাড়োয়ানের মতোই তাকে এক আনন্দ থেকে নবতর আনন্দে এনে

হাজির করছি শুধু! কিন্তু এখন আর আমাকে তার দরকার নেই। সে চ'লে যাবে আপন খেয়ালে, আমি প'ড়ে থাকবো নিঃসংগ একা!

আমার এই ভাবনার জবাবের মতোই বাগানের দিক থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠলো হতাশ চীৎকার—

"কে আছো, বাঁচাও!"

তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলা, চিমনিতে তার প্রতিধ্বনি বেজে উঠলো বিদ্রূপের মতো! আবার সেই শব্দ,—মনে হ'ল বাগানের অপর প্রান্ত থেকেই!

"বাঁচাও, বাঁচাও!"

"মিজেইল, শুনছো মিজেইল!"—ধীরে ধীরে আমার স্ত্রী ডাকছিল—"শুনছো"?

শোবার ঘর থেকে বারান্দায় এল সে, চুল খোলা, একটি মাত্র ঢিলে গাউন পরণে,—রাতের পোষাক। জানলার দিকে কান পেতে সে শুনতে চেষ্টা করলো,—

"কেউ বোধহয় খুন হচ্ছে।"

বন্দুকটা নিয়ে বাইরে গেলাম। ঘন অন্ধকার, তার উপর জোর হাওয়ার ঝাপটায় দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। গেটে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। গাছে গাছে ঝাপটার গর্জন ও ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ, দূরে ডাকছে ভয়ার্ত কুকুর। অন্ধকারে সমস্ত কিছুই একাকার, রেল লাইনে একটা বাতিও জলছে না। বাড়ীর কাছেই আবার সেই ভয়ার্ত চীৎকার—

"বাঁচাও, বাঁচাও!"

"কে, ওখানে কে?"

দুটো লোক যুদ্ধ করছে, একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেললো, দুজনেই হাঁপাচ্ছে ভয়ানক।

একজন বলছিল, "ছেড়ে দাও!"—সে হ'ল আইভান শেপ্রাকভ, তীক্ষ্ণ গলায় সে চেঁচাচ্ছিল—"ছেড়ে দে হারামজাদা জানোয়ার, ছেড়ে দে, নইলে তোর হাত কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।"

অন্যজন হ'ল মোয়েজি, তার মুখে দুটো ঘুষি মেরে আলাদা ক'রে দিলাম। প'ড়ে গিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ালো, মারলাম আর এক ঘা।

"আমাকে ও খুন করছিল,"—বললো মোয়েজি—"ব্যাটা তার মায়ের সিন্দুক ভাঙতে যাচ্ছিল…আমি একে ঘরে আটকে রাখবো, থানায় চালান দেবো।" শেপ্রাকভের মাতাল দশা। মাতাল হ'লেও আমাকে চিনলো, হাঁপাচ্ছিল সে,—এক্ষুনি যেন আবার চীৎকার ক'রে উঠবে, 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

ওদের আলাদা ক'রে দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। আমার স্ত্রী তখন বিছানায় শুয়ে। ঘটনাটা তাকে বললাম, মোয়েজিকে আমি যে কয়েক ঘা লাগিয়েছি সেকথাও লুকালাম না।

"ওঃ, পাড়াগাঁয়ে থাকা কী সাংঘাতিক!"—সে বলছিল—"ওঃ কী লম্বা রাত, রাত ফুরোলেও বাঁচতাম!"

একটু পরেই আবার সেই আর্তনাদ—"বাঁচাও, বাঁচাও!"

"এক্ষুনি গিয়ে থামিয়ে দিই।"

"না, না, এ ওর গলা কামড়ে ছিঁড়ুক"—রাগে বিরক্তিতে ব'লে উঠলো মাশা, ছাতের দিকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে শুনছিল সে, আমি ব'সে আছি পাশে, একটা কথাও বলতে সাহস হচ্ছে না। আঙিনার মধ্যে খুনখারাবি ও চীৎকার, এমন কি এই দীর্ঘরাতের জন্যও দায়ী একমাত্র আমি, অপরাধী আমি।

নিঃশব্দ নীরব ঘর। জানলা পথে একটুখানি আলো ফুটে উঠবার

প্রতীক্ষা করছি শুধু। আর, মাশা এমনভাবে তাকিয়ে আছে—যেন এইমাত্রই সে একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বিস্ময়ভরে ভাবছে খালি! ভাবছে যে, তার মতো একজন উচ্চশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী ও মর্যাদাসম্পন্না নারী কি ক'রে এসে পড়লো এই নোংরা গাঁয়ের গণ্ডীতে,—কতগুলি হীন জঘন্য লোকের মধ্যে; এবং তাদেরি একজনকে দেখে মুগ্ধ হবার মতো মারাত্মক ভুল কী ক'রে হ'ল তার,—এমন কি দীর্ঘ এই ছ-মাস ধ'রে তার সহধর্মিনী হবার! শেপ্রাকভ, মোয়েজ্জি বা আমি—যেই হোক না সবাই সমান তার কাছে। উন্মত্ত ঐ বর্বর চীৎকারে—ঐ "বাঁচাও-"র মধ্যে একাকার হয়ে গেছে সমস্ত কিছু: আমি, আমাদের পরিণয়, সম্মিলিত কাজকর্ম, কাদা, বর্ষা, শীত,—সমস্ত। বিছানায় একটুখানি তার মোড় ফিরে শোবার মধ্যে, তার দীর্ঘশ্বাসে, তার মুখের চেহারায় আমি পড়ছিলাম—"ওঃ, ভোর হ'লেই হয়!"

ভোর হ'লে সে চ'লে গেল, তিন দিন তার প্রতীক্ষা করলাম দ্যুবেত্‌স্নিয়াতে। তারপর, সমস্তকিছু বেঁধে-ছেঁদে একটা ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখে শহরে এলাম। এঞ্জিনীয়ারের ওখানে পৌঁছলাম এসে ঘোর সন্ধ্যাবেলা। আলোগুলি জ্বলছে গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে! প্যাভেল চাকরটা বললো যে, বাড়ীতে কেউ নেই, এঞ্জিনীয়ার সাহেব গেছেন পিটার্সবার্গে, মেরিয়া ভিক্টরভ্‌না সম্ভবত আঝোগিনের ওখানে রিহার্সেলে! মনে পড়ে, প্রথম যেদিন সেখানে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কাঁপছিল বুক, উপরে উঠেও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম নীরব নির্বাক; সেই সংগীত-স্বর্গে প্রবেশ করতে সাহস হচ্ছিল না। মস্ত বড় ঘরটার চারদিকেই আলোর মেলা,—প্রত্যেক জায়গায়ই তিন তিনটা বাতি। প্রথম অভিনয়ের দিন তের তারিখ। প্রথম রিহার্সেল সোমবারে—আঁটকুঁড়ে দিনে। এ সমস্তই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই!

থিয়েটারের সমস্ত ভক্তেরাই এসে জুটেছে এখানে। বড় মেজো ও ছোট রঙ্গমঞ্চের উপরে পায়চারি ক'রে ক'রে অভিনয়ের পাঠ মুখস্ত করছে। রাদিশ দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে স্থির নিস্পন্দ, মাথাটা দেয়ালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে আছে সামনে,—কখন রিহার্সেল সুরু হবে। সবই ঠিক আগের মতো!

কর্ত্রীর কাছে পথ ক'রে এগোচ্ছিলাম নমস্কার জানাতে; কিন্তু সকলেই 'চুপ্ চুপ্' ব'লে একপাশে স'রে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলো। চারদিকেই একটা নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। এবারে তোলা হ'ল পিয়ানোর আবরণ, সেখানে একটি মহিলা ব'সে ছিলেন। মাশা পিয়ানোর কাছে এগিয়ে এল, গায়ে আধা বুকখোলা জামা; ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে! কিন্তু সে এক নতুন ধরণের সৌন্দর্য; এ যেন আমার সেই মাশা নয়, বসন্তকালে যে 'মিলে' এসে আমার সংগে দেখা করতো পরম খুশিতে। মাশা গাইছিল—"কেন ভালোবাসি এই জ্যোৎস্না-উছল রাতি?"

এতদিনকার বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই প্রথমবারই তার গান শুনলাম! কেমন জোরালো ও মিষ্টি তার-গলা, কী সুন্দর! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, উপভোগ করছি যেন কোনো দামী ফলের মিষ্টি গন্ধ! গান থামলে সভাজন জানালো উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ! তার মুখে ফুটে উঠলো উজ্জ্বল খুশির হাসি, চঞ্চল চোখ দুটি চারিদিকে সে বুলিয়ে নিল একবার, পোষাকটা মাজলো সযত্ন হাতে। ঠিক যেন, খাঁচা ভেঙে একটি সুন্দর পাখী নীল আকাশে মেলে দিয়েছে স্বাধীন খুশির ডানা। কান ঢেকে সে কেশবিন্যাস করেছে, মুখে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো একটা অশোভন ভঙ্গী। সবাইকে সে যেন প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছে একান্ত অবহেলায়!

সেই মুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক তার গাড়োয়ান ঠাকুর্দার মতোই!

"ও, তুমিও এখানে?"—আমার দিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল,—"আমার গান শুনেছো তো? কি রকম লাগলো তোমার?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সে ব'লে চললো—"ভালোই হ'ল, তুমি এসেছো যা হোক! আজ রাতেই আমি পিটার্সবার্গে যাচ্ছি কয়েক-দিনের জন্যে, যেতে দেবে তো, কি বলো?"

তার সংগে ষ্টেশনে এলাম মাঝরাতে,—করুণাভরে সে আমাকে আলিঙ্গন করলো,—সম্ভবত আমি যে তাকে নানারকম প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করিনি এই কৃতজ্ঞতাবোধেই! আমায় চিঠি লিখবে কথা দিল সে। অনেকক্ষণ তার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ধ'রে রেখে ধীরে ধীরে চুমো খেলাম; চোখের জল কিছুতেই বাধা মানছিল না, মুখ ফুটে বেরুলো না একটা কথাও!

সে চ'লে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম তার ট্রেণের দ্রুত বিলীন আলো। মনে মনে আমাব সমস্ত প্রাণ তাকে আলিঙ্গন ক'রে রইলো,—মুখে জেগে উঠলো অস্ফুট কথা:

"আমার আদরের মাশা, আমার মাশা, সুন্দরী মাশা!"

রাতটা কার্পোভ্‌নার ওখানে কাটিয়ে ভোরেই কাজ করতে গেলাম র‍্যাদিশের সংগে।

(সতেরো)

আমার বোন রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমার সংগে এসে চা খেত।

"আজকাল খুব পড়ি আমি।"—এখানে আসবার পথে লাইব্রেরী

থেকে কি সব বই এনেছে আমাকে দেখালো সে। "তোমার মাশা আর ভ্লাদিমিরকে আমার ধন্যবাদ, তারাই আমার চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে আমিও মানুষ! আমার মুক্তিদাতা তারা! এর আগে দুপুর রাতেও আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকতো কত কী দুশ্চিন্তা,—এই হপ্তায় কতটা চিনি লাগলো, খাবারটায় বেশী নুন দিয়ে ফেলিনি তো আবার—এমনি কত কিছু! এখনো অবশ্যি রাত জাগি আমি,—কিন্তু সে চিন্তা একেবারেই আলাদা জগতের। দুঃখ হয়, এই অর্ধেকটা জীবনই চ'লে গেল ভয়ে আর বোকামিতে। অতীতের উপরে ঘৃণা হয় আমার, হয় লজ্জা! বাবাকে দেখি আজ শত্রুর মতো। সত্যিই, তোমার স্ত্রীর কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ! আর ভ্লাদিমিরও কী চমৎকার মানুষ! এরা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।"

"কিন্তু, রাতে ঘুমোতে না-পারা তো ভালো নয়!"

"অসুখ হবে ভাবছো তুমি। না, মোটেই না। ভ্লাদিমির পরীক্ষা ক'রে দেখেছে—ভালোই আছি আমি। তা'ছাড়া, স্বাস্থ্য দিয়ে হবে কী, এ তেমন একটা কিছুই নয়।···আচ্ছা, তাই না?"

মনে জোর চাইছে সে,—স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম। মাশা চ'লে গেছে, ডাক্তার ব্লাগোভো পিটার্সবার্গে; আমি ছাড়া সারা শহরে এমন মানুষটি নেই যে বলবে তুমি ঠিকই বলেছো! আগ্রহ ভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, আমার মনের কথা বুঝে নিতে চাইছিল। আমি যদি এখন নীরবে বা আপন মনে ব'সে থাকি শুধু, সে ভাববে যে তার জন্যেই দুঃখ পাচ্ছি আমি। তাই, সব সময়েই সজাগ থাকতে হয় আমার। সে ঠিক করেছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই আমি উত্তর দিই, হাঁ, ঠিকই ক'রেছে সে, কোনোই ভুল হয়নি; তার উপরে গভীর বিশ্বাস আছে আমার।

"জানো, থিয়েটারে আমাকে পার্ট দেওয়া হয়েছে?"—আমার বোন বলছিল—"ষ্টেজে আমি অভিনয় করবো; আমিও বাঁচতে চাই, ভ'রে তুলতে চাই জীবনের পিয়ালা। আমি যে খুব ভালো পারবো, তা নয়,—তা পার্টও তো শুধু দশ লাইন। তবু এ ঢের ঢের ভালো,—দিনে পাঁচবার ক'রে চা ক'রে দেওয়া, রাঁধুনে বেশী না খায় তা ব'সে পাহারা দেওয়ার চেয়ে এ শতগুণে শ্রেষ্ঠ! আর, বাবাও দেখুন যে আমিও বিদ্রোহ করতে পারি।"

চা-খাওয়ার পরে আমার বিছানায় শুয়ে কিছুকাল চোখ বুজে রইলো সে। কী মলিন তার মুখখানি।

"বড় দুর্বল লাগে!"—উঠে ব'সে সে বললো—"ভ্লাদিমির বলে, কুঁড়েমির ফলেই নাকি শহরের সব মেয়েদের রক্ত শুষে গেছে। সত্যিই, ভ্লাদিমিরের কী বুদ্ধি, কেমন চতুর সে। ঠিকই বলেছে সে, একেবারে ঠিক কথা। আমাকেও কাজ করতে হবে।"

দুদিন পরে সে থিয়েটারে এল,—হাতে রিহার্সেলের খাতা, পরণে কালো পোষাক, গলায় প্রবালের মালা, ব্রোচটা দূর থেকে দেখায় থ্যাব্‌ড়া, কানে দুটো ঝলমলে ইয়ারিং। তাকে দেখে কেমন অস্বস্তি লাগছিল, ইস্‌ রুচির কী অভাব! সবচেয়ে অশোভন হয়েছে ইয়ারিং জোড়া! পোষাক পরাও অদ্ভুত ধরণে,—অনেকেই তা মন্তব্য করছিল। অনেকের ওষ্ঠেই দেখা গেল বাঁকা হাসি, কে যেন হেসেই উঠলো,—"স্বয়ং ইজিপ্টের ক্লিওপাত্রা যে!"

সে ভদ্রসমাজের আদবকায়দায় সহজ স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করছিল; ফলে দেখাচ্ছিল তাকে উদ্ধত ও অশোভন। সমস্ত সরলতা ও মাধুর্যই হারিয়ে ফেলেছে সে।

"বাবাকে এইমাত্র ব'লে এলাম, রিহার্সেলে যাচ্ছি আমি,"—আমার

কাছে এসে বলতে লাগলো—"কিন্তু তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন আমাকে তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন এবং সত্যি সত্যি প্রায় মারতেই আসছিলেন আর কি! আমার পার্ট কিন্তু মুখস্ত নেই।"—খাতাটার দিকে সে তাকালো—"সব গোল পাকিয়ে ফেলবো নিশ্চয়ই। থাক্, যা হবার হবে, যাত্রা তো স্বুরু হয়েছে···" হঠাৎ সে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

তার মনে হচ্ছিলো সবার চোখই তার দিকে, বিস্ময়ভরে তারা লক্ষ্য করছে তার প্রতিটি পা-ফেলা,—তার কাছ থেকে সবাই যেন অসাধারণ একটা কিছু আশা করছে। তাকে তখন বোঝানো শক্ত যে তার মতো তুচ্ছ জীব কারো নজরে পড়ার কথাই নয়!

তৃতীয় অংক পর্যন্ত একটানা বিশ্রাম; তার পার্ট হ'ল একজন গ্রাম্য মেয়ের,—শুধুমাত্র দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিছু একটা শোনার ভঙ্গীতে, তারপরেই স্বগত কয়েকটি কথা। এই পার্টটুকুর আগেই পুরো দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম। ষ্টেজের উপরে ঘোরাফেরা ক'রে সবাই পার্ট মুখস্ত করছে, চা খাচ্ছে, করছে নানা আলোচনা। ক্লিওপাত্রা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে, বিড় বিড় ক'রে সে পার্ট মুখস্থ করছিল ও কম্পিত হাতে কাগজটা ভাঁজ করছিল বারবার। প্রত্যেকের চোখই তার দিকে, সবাই তাকে দেখবার প্রতীক্ষায় আছে,—এই মনে ক'রে কম্পিত হাতে সে চুল পালিশ করছিল বাববার।

"নিশ্চয়ই একটা গোল পাকিয়ে ফেলবো, গলা যেন কাঠ হয়ে আসছে,—তোমরা বুঝবে না। গা এমন কাঁপছে, যেন ফাঁসীকাঠেই ঝুলতে যাচ্ছি।"

এবার এল তার পালা।

"ক্লিওপাত্রা, এবার তোমার।"—ম্যানেজার ব'লে দিলেন।

ষ্টেজের মাঝখানে এল সে, সারা মুখে ভয়ের ছাপ, তাকে দেখাচ্ছিল বিশ্রী, কাঠ কাঠ। কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইলো সে কাঠের পুতুলের মতোই, কানে দুলছে শুধু ইয়ারিং দুটি।

"প্রথমে প'ড়ে নিতে পারো"—কে যেন বললো।

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে কাঁপছে সে, এত ভয়ানকভাবে কাঁপছে যে কথাও বলতে পারছে না, খুলতেও পারছে না হাতের কাগজ। অভিনয় করা তো একেবারেই অসম্ভব! তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম,—কিন্তু ইতিমধ্যেই সে হাঁটুর উপরে ব'সে পড়লে ষ্টেজের ঠিক মাঝখানেই এবং হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো।

চারদিকে তখন হৈ-চৈ কাণ্ড। একা আমি দাঁড়িয়ে আছি স্থির নিস্পন্দ, হেলান দিয়ে নিয়েছি পাশের সিনটার গায়ে,—নির্বাক, বিমূঢ় দেখছিলাম, কয়জনে মিলে তাকে তুলে নিয়ে এল বাইরে। তখন অনীতা এল আমার কাছে। এখানে আগে তাকে লক্ষ্য করিনি হঠাৎ যেন সে আকাশ থেকেই নেমে এল। মাথায় তার টুপি, গায়ে ওড়না, ভাবটা এমন যে এক মুহূর্তের জন্যেই কেবল সে এসেছে।

"আমি ওকে আগেই বারণ করেছিলাম।"—রাগতই বলছিল সে প্রত্যেকটি কথায় ঝাঁকানি দিয়ে, সারা মুখ তার লাল হয়ে উঠলো— "আচ্ছা পাগলামি! আপনার অন্তত বারণ করা উচিত ছিল।"

মাদাম আঝোগিম দৌড়ে এলেন এদিকে। বুকের উপর সিগারেটের ছাই,—

"ওঃ কী সাংঘাতিক!" তিনি হাঁপাচ্ছিলেন আর হাত কচলাচ্ছিলেন খালি। তার আর একটা অভ্যাস ছিল—মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে কথা বলা। "এ কি ভয়ানক কথা! তোমার বোনের এই অবস্থায়···ছেলে হবে··· হাতজোড় ক'রে বলছি বাবা, লক্ষ্মী বাবা, শিগগির নিয়ে যাও একে।"

ভয়ানক হাঁপাচ্ছিলেন তিনি, পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর তিন মেয়ে, দেখতে ঠিক মায়ের মতোই! ভয়ে তারা জড়োসড়ো হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে অভিভূতের মতো,—তাদের সামনেই যেন ধরা পড়েছে কোনো খুনী আসামী! কী লজ্জা, কী অপমান! অথচ এই সম্ভ্রান্ত পরিবারই নাকি সারা জীবন যুদ্ধ ক'রে মরছে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তাদের বিশ্বাস, মানবজাতির সমস্ত কুসংস্কার ও ভুলভ্রান্তি শৃংখলাবদ্ধ হয়ে আছে তাদের ঐ তিন-মোমের বাতিতে, মাসের তেরো তারিখে, আর নিষ্ফলা সোমবারেই মাত্র!

"অনুরোধ করছি বাবা, হাত ধ'রে বলছি"—মাদাম আঝোগিনের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—"এক্ষুণি বাড়ী নিয়ে যাও একে, ওঃ কী সাংঘাতিক, কী ভয়ানক!"

(আঠারো)

আমার বোন ও আমি হেঁটে চলেছি রাস্তা ধ'রে ; আমার কোটটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তার দেহ। পিছনের রাস্তায় আলো নেই, পথিকদের এড়িয়ে আমরা তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছি ঠিক পলাতকের মতো। এখন আর কাঁদছে না সে, শুষ্ক চোখে আমার মুখে চেয়ে আছে। কার্পোভ্‌নার ওখানে তাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, এই বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ভেবে নিলাম আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের রূপ। প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনা ক'রে আমরা ভালোভাবেই বুঝে নিলাম আমাদের বর্তমান অবস্থা……

এটা স্থির কথা, এই শহরে থাকবো না আর, আয় একটু বাড়লেই চ'লে যাব আর এক জায়গায়। প্রায় ঘরেই ঘুমুচ্ছে সবাই, কোথাও চলেছে তাস খেলা! আমরা ঘৃণা করি এদের, এদের ভয় করি। আমরা

আলোচনা করছিলাম, সমস্ত ধনী ও সম্মানিত পরিবারবর্গের জীবনধারা কী স্থূল জঘন্য, কী নীচ! আজ কী রকম আঁৎকে উঠলো আমাদের এই নাট্য-শিল্পীর দল! বারবারই প্রাণের মধ্যে এই প্রশ্ন মাথা ঠুকে মরছিল—এইসব মূর্খ অলস শঠ ও ঠগের দল কুরিলোভকার যত অন্ধ অজ্ঞ ও মাতাল কিষাণদের চেয়ে কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ? পশুর চেয়েও অধম নয় তারা কিসে? তাদের অভ্যস্ত অন্ধ জীবনেও যদি নতুন কিছু এসে হঠাৎ উপস্থিত হয়, তারাও তো ঠিক অমনিই আঁৎকে ওঠে। ওঃ, আজ যদি বোনকে আমাদের বাড়ীতে প'ড়ে থাকতে হ'ত, কী দুর্দশাই না ছিল তার কপালে?

কী অসহ্য দুঃখই পেত সে বাবার কথায়, পরিচিত লোকের অর্থযুক্ত আনাগোনায়? মনে মনে আমি এঁকে দেখলাম সেই দুঃসহ ছবি। সংগে সংগেই আমার সামনে জেগে উঠলো আমারই পরিচিত সব আর্তজন—যারা তাদের আত্মীয়দের হাতেই দিন দিন ভোগ করছে জীবন্ত মৃত্যু; মনে পড়লো উৎপীড়নের চোটে পাগল-হয়ে-যাওয়া সেই কুকুরগুলিকে, আর ভীরু চড়ুইগুলিকে—দুষ্টু ছেলেরা যাদের পাখা একটা একটা ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে জ্যান্তই মেরে ফেলেছিল। মনে পড়ে, তাদের সেই অসহায় ছটফটানি, করুণ আর্তনাদ! শৈশবে দেখা এমনি আরো কত যন্ত্রণার ছবি! হঠাৎ আমার মনে হ'ল, এই শহরের ষাট হাজার লোক বেঁচে আছে কি জন্যে; কি জন্যে পড়ে তারা ধর্মবাণী, কেন করে প্রার্থনা, কেন পড়ে নানারকম জ্ঞানগর্ভ বই-পত্রিকা! এতদিনের এত বাণী, এত লেখা দিয়ে লাভ হ'ল কী,—এখনো যদি তাদের আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যুময় অন্ধকার, জেগে থাকে বিদ্বেষ বিষ? একজন দক্ষ মিস্ত্রী ঘর তৈরী ক'রে ক'রেই বুড়ো হয়ে যায়, অথচ মৃত্যুর দিন পর্যন্তও সে গ্যালারিকে বলে গেলাড়ি?

তেমনি ঠিক সর্বত্রই। এই ষাট হাজার লোক প'ড়ে আসছে, শুনে আসছে সত্য সততা প্রেম ও স্বাধীনতার বাণী,—তবু একটানা প্রবহমান সেই মিথ্যা কথা অত্যাচার আর অবিচারের কালো স্রোত! স্বাধীনতাকে দেখে তারা ভয়ের চোখে, দেখে বিষম শত্রুর মতো!

বাড়ী পৌছেই আমার বোন বললো—"ভবিষ্যতের পথ আমার নির্দিষ্ট হ'ল আজ। এর পরে আর সেখানে যাওয়া যাবে না। ভালোই হ'ল! আমার প্রাণটা সত্যিই হাল্কা হয়ে গেছে।"

শিগগিরি শুতে গেল সে। তার চোখের পালকে অশ্রুবিন্দু, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত। একটি গভীর ঘুমে শান্ত হয়ে রইলো সে। দেখেই বোঝা যায়, প্রাণ তার হাল্কা হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম করছে সে। অনেকদিন পরেই এমন সুখে ঘুমুচ্ছে সে।

এবার সুরু হ'ল আমাদের দুজনের জীবন। সব সময়ই গুনগুন ক'রে গান গায় সে, বলে যে ভারী সুখে আছে। তার জন্যে আনা বইগুলি না-পড়া অবস্থায়ই প'ড়ে থাকে, আমি লাইব্রেরীতে ফেরৎ দিয়ে আসি। দিনরাত ব'সে বুনতে থাকে সে অলস স্বপ্নজাল, বলে তার অনাগত জীবনের ভাবনার কথা। মাঝে মাঝে কখনো বা সে আমার জামা কাপড় রিপু করে বা রান্নাবান্নায় সাহায্য করে। সবসময়েই গান গায় অথবা তার ভ্লাদিমিরের কথা বলে,—কী বুদ্ধিমান সে, কেমন চতুর, কী সুন্দর তার আদব কায়দা। কী দরদ অথচ কী গভীর তার জ্ঞান! আমি শুধু সায় দিয়ে যাই—যদিও আজকাল আমি তার ডাক্তারকে পছন্দ করি না। আমার বোন কোনো কাজে ঢুকে স্বাধীন জীবন চালাতে চায়। প্রায়ই বলে সে, শিক্ষয়িত্রী বা ধাত্রী হবে,—শরীরটা একটু সারলেই হয়। বাসার ধোয়ামোছা কাজ নিজেই করতে

পারবে সব। এর মধ্যেই সে তার খোকাকে ভালোবেসে ফেলেছে। এখনো সে তার কোল জুড়ে আসে নি বটে, কিন্তু আগেই জানে সে,—কেমন তার চোখ, কেমন সুন্দর কচি কচি হাত দুটি, কেমন সুন্দর ফিক ফিক ক'রে হাসবে সে। শিক্ষা বিষয়ে কথা বলতে ক্রিওপাত্রা ভালোবাসে আজকাল এবং যেহেতু তার ভ্লাদিমিরই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাই শিক্ষা-উদ্দেশ্যে তার সমস্ত সমালোচনাই একটিমাত্র প্রশ্নে এসে দাঁড়ায়,—খোকাকে কী ক'রে তার বাবার মতো ক'রে গড়া যায়? কথা আর কথা, তার কথা আর থামেই না। প্রত্যেকটি কথায়ই সে খুশি হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে আমারও অবশ্যি আনন্দ হয়। জানি না কেন।

সম্ভবত, তার স্বপ্নালুতা নেমে এসেছে আমারও জীবনে; আমিও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি, ভেসে চলেছি স্বপ্ন-সায়রে। কোনো কাজ নেই হাতে, সন্ধ্যেবেলা পায়চারি করি ক্লান্ত দেহে, আর মাশার কথা বলি শুধু।

বোনকে বলি—"তুমি বলো, ফিরে আসবে না সে? আসবে আসবে মন কিন্তু বলছে,—বড়দিনের ছুটিতে সে আসবেই, এর বেশী দেরী করবে না। ওখানে কী বা করবে আর?"

"তোমার কাছে চিঠি দেয়নি যখন, সোজাই বোঝা যাচ্ছে শিগগিরই ফিরছে সে।"

"তা ঠিক।"—সায় দিই, যদিও ভালো ক'রেই জানি আমি আমার মাশা আর ফিরে আসবে না।

তাকে ছাড়া সারা দুনিয়া আমার শূন্য মরু! নিজেকে এখন আর ভুলিয়ে রাখতে পারি না, অন্যকেও ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আমার বোন আছে তার ডাক্তারের প্রতীক্ষায়, আমি মাশার

দু'জনেই সবসময় আলোচনা করি, হাসি,—কার্পোভ্‌নাকে ঘুমুতে দেই না পর্যন্ত! উনুনের ধারে শুয়ে সে বিড় বিড় করতে থাকে:

"উনুনটায় আজ শোঁ শোঁ শব্দ না হয়ে শাঁ শাঁ শব্দ হয়েছে। এ তো ভালো নয়, মোটেই ভালো নয়, নিশ্চয়ই একটা অমঙ্গল হবে!"

এক পিওন ছাড়া কেউই আসে না আমাদের কাছে, সে এসে বোনকে ডাক্তারের চিঠি দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা প্রকোফি আসে, একটা কথাও না ব'লে আমার বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু, তারপর চ'লে যায়।

বাইরে রান্নাঘরে আসতে আসতে প্রকোফি বলে,—"প্রত্যেকেরই একটা নিয়মকানুন আছে, তা খেয়াল থাকা উচিত। অহঙ্কারে কেউ যদি সে কথা ভুলে যায় তো চোখের জলে ভাসবে সে"।

"চোখের জলে ভাসবে" কথাটা সে খুবই ব'লে থাকে। একদিন, বড়দিনের ছুটিতেই—সে আমাকে তার মাংসের দোকানে ডেকে নিয়ে গেল, সে আমার সংগে এমন কি করমর্দন করাও দরকার বোধ করলো না,—সে বললো আমার সংগে নাকি তার জরুরী কথাবার্তা আছে। ভোদকা আর তুষারের চোটে মুখ তার লাল, ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে নিকোল্‌কা। ছেলেটার চেহারা আস্ত একটি গুণ্ডার মতো, হাতে রক্তমাখা একটা ভোজালি!

"একটা কথা আপনাকে বলতে চাই,"—প্রকোফি বলছিল—"এরকমভাবে তো চলা আর সম্ভব নয়, কারণটা নিজেই বুঝতে পারছেন। লোকে এই আপনাদের বা আমাদের কাউকেই ভালো বলবে না। মা নিজে লজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দেখুন, আপনার বোনকে আর কোথাও স'রে যেতে হবে,—তার যা অবস্থা,—দেখুন আর পারবো না আমি,—তার চালচলনই আমি বরদাস্ত করি না! বুঝলেন?"

বুঝলাম, ওর দোকান থেকে চ'লে এলাম। সেদিনই বোনকে নিয়ে এলাম রাদিশের ওখানে। গাড়ী ডাকার পয়সা নেই, পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলাম। আমার পিঠে মালপত্তরের একটা বোঝা। আমার বোনের হাতে কিছুই না দিলেও বারবার সে কাশছিল আর হাঁপাচ্ছিল, বারবারই জিজ্ঞেস করছিল,—"আর কতো দূর ?"

(উনিশ)

শেষপর্যন্ত মাশার চিঠি এল :

"প্রিয় মিজেইল, বুড়ো চিত্রকরের সম্বোধনে 'ভালোমানুষটি', তুমি সুখে থাকো। বাবার সংগে আমেরিকায় যাচ্ছি আমি প্রদর্শনীতে; কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পাবো সমুদ্র,—দ্যুবেত্স্নিয়া থেকে কতদূরে, ভাবলেও গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! অতল গভীর সে ব্যবধান—সীমাহারা আকাশের মতো ! আমার একমাত্র সাধ সেখানে মেলে দেবো মুক্ত খুশির ডানা। বিজয়িনীর হাওয়া লেগেছে আমার গায়ে, আমি পাগল,—তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো কীরকম আবোল-তাবোল ব'কে যাচ্ছি। প্রিয়, তুমি এত ভাল, আমায় তুমি স্বাধীন ক'রে দাও, তাড়াতাড়ি খুলে দাও বাঁধন—যে বাঁধন তোমার সংগে এখনো আমাকে বেঁধে রেখেছে। তোমার সংগে পরিচয় আমার জীবনে এনেছে স্বর্গের আলো, উজ্জ্বল ক'বে দিয়েছে আমার জীবন। কিন্তু, তোমার স্ত্রী হওয়াটাই ভুল হয়েছে আমার। তুমি নিজেও তা বুঝতে পারো। সেই ভুলের চেতনায় আজ আমি ক্লিষ্ট, আজ তোমার দুটি হাত ধ'রে বলছি, হাঁটু গেড়ে মিনতি করছি, ওগো আমার দরদী বন্ধু, সাগর পাড়ি দেবার আগেই, তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি টেলি ক'রে দাও,—

তোমার আমার দুজনেরই ভুল শুধরে দাও, আমার ডানা থেকে খুলে দাও এই পাষাণভার। বেশী নিয়মমাফিক আবেদন পাঠাতে বারণ করেছেন বাবা, তিনি নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। কাজেই, এবারে আমি ডানা মেলে দিতে পারি,—যে দিকে খুশি? তুমি নিজেই বলছো তো? আঃ, কী চমৎকার!

"সুখী হয়ো তুমি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। পাপী মানুষ আমি। তবে ভালোই আছি, দু'হাতে টাকা উড়োচ্ছি—যেমন খুশি। ভগবানকে আমার বারংবার ধন্যবাদ, আমার কোনো সন্তান না থেকে বেঁচে গেছি আমি। গান গেয়ে প্রশংসা পাচ্ছি,—কিন্তু এ শুধু মোহ নয়,—এই আমার স্বর্গ, আমার শান্তির নীড়! রাজা ডেভিডের আংটির উপরে খোদাই ছিল একটা বাণী—"সবই চ'লে যায়।" মন খারাপ থাকলে এই কথা কটিই মুখে হাসি ফিরিয়ে আনে, মুখে হাসি থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমিও ঐরকম একটা আংটি করেছি—এবং এই কবচই আমাকে দূরে রাখে সমস্ত রকম মোহ থেকে। সবই চ'লে যায়, জীবনও। কী আর চাই? অথবা কী আর চাই, একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া! কারণ, স্বাধীন হ'তে পারলে কেউ কিছুই চায় না,—না, কিছুই না! খুলে দাও বাঁধন, ভেঙে দাও বাধা। তোমাকে ও তোমার বোনকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি। ক্ষমা করো, ভুলে যাও তোমার মাশাকে।"

আমার বোন শোয় একঘরে, আর কতকটা সুস্থদেহে রাদিশ শোয় অন্য একঘরে। চিঠিটা যখন পেলাম আমার বোন আলগোছে উঠে গেল রাদিশের ঘরে ও রাদিশের কাছে ব'সে গলা ছেড়ে বই পড়তে লাগলো। রোজই সে তাকে প'ড়ে শোনায় অস্ট্রোভস্কি বা গোগোল। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বরাবর চোখ রেখে শুনতে থাকে রাদিশ, ভুলেও

হাসে না কখনো ; সবসময়েই সে মাথা নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করতে থাকে আপনমনেই—

"যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, যে কোনো কিছু।" বইতে যদি কুৎসিত বা অশোভন কিছু চিত্রিত হয় তো আঙুলটা সে জায়গায় ঠেসে ধ'রে হিংস্রভাবেই সে বলতে থাকে,—

"এই, ফের আবার মিথ্যে কথা, এ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলছে!"

নাটকের উপরে তার গভীর আগ্রহ ; তার বিষয়বস্তু, মূলনীতি, তার জটিল অংশ-যোজনাই তাকে মুগ্ধ ক'রে রাখে। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করে না সে কখনো,—বলে "লোকটি"। "কী চমৎকার লিখেছে লোকটা।"

আমার বোন ধীরে ধীরে আর এক পৃষ্ঠা প'ড়ে আর পড়তে পারলো না ; তার স্বর ধ'রে এসেছে। রাদিশ তার হাতটা হাতে নিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠ নেড়ে নেড়ে অস্ফুট ভাঙা স্বরে বলে :

"সাধুর আত্মা শুভ্র, আয়নার মতো মসৃণ, কিন্তু পাপীর প্রাণ পাষাণের মতো। সাধুর প্রাণ পরিষ্কার তেলের মতো, কিন্তু পাপীর প্রাণ আলকাত্‌রা। শ্রম আছে, দুঃখ আছে, রোগ আছে জীবনে। যে শ্রম করে না ও দুঃখ পায় না, স্বর্গেও যায় না সে ; ধনী, ভুঁড়িওয়ালা, অত্যাচারী বা সুদখোরের দল শান্তি পাবে না, স্বর্গরাজ্য তাদের জন্য নয়। পোকা খায় ঘাস, মরচে খায় লোহা—"

"মিথ্যা কথা খায় আত্মাকে!"—আমার বোন হেসে ওঠে।

আবারো আমি চিঠিটা পড়ছিলাম, ঠিক তখনই বাড়ীতে একটি সৈন্য এসে ঢুকলো ; সপ্তাহে দু'বার ক'রে সে সুগন্ধি-মাখা ফরাসী রুটি ও মাংস নিয়ে আসে। সে এক অচেনা হাতের দান। কোনো কাজ নেই। দিনের পর দিন শুধু ব'সেই আছি বাড়ীতে। সম্ভবত যে

আমাদের ফরাসী রুটি পাঠিয়েছে সে জানে আমাদের নিদারুণ কষ্টের কথা।

শুনতে পাচ্ছিলাম, আমার বোন সৈন্যটির সংগে কথা বলছে ও খুশিতে হাসছে। তারপর সে এসে শুয়ে শুয়ে কিছুটা রুটি খেলো ও আমাকে বললো :

"তুমি যখন চাকুরী নিতে চাইলে না, হতে চাইলে চিত্রকর,—অনীতা ও আমি বুঝেছিলাম যে ঠিকই করছো তুমি; কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলতে সাহস পাইনি। বলো তো, আমাদের ভাবনার টুঁটি টিপে ধরে কে? এই অনীতার কথাই ধরো, সে তোমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে,—জানে তোমার জীবনধারাই ঠিক। আমাকেও সে ভালোবাসে বোনের মতো, জানে ঠিকই বেছে নিয়েছি আমার চলার পথ, এমন কি আমার জীবন তার কাছে ঈর্ষার বস্তু! কিন্তু আমাদের সংগে দেখা করতে বাধে তার, সংকোচ হয়, ভয়ও হয়!"

বুকের উপর দুই হাত চেপে ধ'রে আবেগভরে সে বলতে লাগলো : "সত্যি, তোমাকে সে যে কী ভালোবাসে,—একবারো বুঝতে যদি! আমি ছাড়া কারো কাছে সে মনের কথা খুলে বলেনি—তাও বলেছে খুব গোপনে, অন্ধকারের আড়ালে। বাগানের একটা অন্ধকার বীথিপথে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলতে লাগলো সে,—তুমি তার বুকের মানিক। দেখবে তুমি, কখনোই আর সে বিয়ে করবে না,—সে যে সত্যিই ভালোবাসে তোমাকে! তার জন্য দুঃখ হয় না তোমার?

"হ্যাঁ।"

"সে-ই রুটি পাঠিয়ে দিয়েছে। সত্যি, অদ্ভুত মেয়ে সে, কেন এত লুকোচুরি? আমিও একদিন অদ্ভুত ছিলাম, ছিলাম বোকা! আজ

কিন্তু পেরিয়ে এসেছি সেই সব দিন, কাউকে দেখেই আর আজ আঁৎকে উঠি না। ভাবি ।খু শ ; নিজেকে মেলে ধরি আপন খুশিতে ; সত্যি সুখী আমি! বাড়ীতে ছিলাম যখন, জানতাম না সুখ কী জিনিষ ; আজ আমি রাণীর সংগেও আমার বর্তমান জীবন বিনিময় করতে চাই না!"

ডাক্তার ব্লাগোভো এসে উপস্থিত হ'ল। ডাক্তারী উপাধি নিয়েছে সে, তাব বাবার সংগে এখন সে আমাদের এই শহরেই থাকে। কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার নাকি পিটার্সবার্গে যাবে। এবারে সে রোগ-প্রতিষেধক বিষয়ে গবেষণা করতে চায়, তার একটা বিষয় বোধহয় কলেরা। বিদেশে যাবে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে, তারপরে হবে প্রফেসর। সৈন্য-বিভাগের কাজ ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছে সে,—তাই পোষাকও বদলে গেছে। এখন পরে সে পুরো ট্রাউজার, কোট, চমৎকার গলাবন্ধ, এবং লাল সিল্কের রুমাল! তাকে দেখে আমার বোন খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে! আমার মনে হয় ব্লাগোভো এসব পরে ফ্যাসান করার জন্যেই, বুকপকেট থেকে রুমালটা সে ঝুলিয়ে রাখে একটুখানি! একদিন কোনো কাজ ছিল না হাতে, আমার বোন আর আমি ব'সে ব'সে গুণলাম কতোগুলি 'স্যুট' দেখেছি তার ;—কমপক্ষে দশটা হবেই। আগের মতোই আমার বোনকে সে এখনও ভালোবাসে, কিন্তু তাকে পিটার্সবার্গ নিয়ে যাবার কথা ভুলেও বলে না একবার,—এমন কি ঠাট্টা ক'রেও নয়। প্রাণে বেঁচে থাকলে আমার বোন ও তার সন্তানের যে কী দশা হবে—ভেবে ভেবে আমি কোনো কূল-কিনারা পাই না। দিন রাত আমার বোন ব'সে ব'সে শুধু স্বপ্নের জাল বুনে চলে ; ভবিষ্যতের কোনো দুর্ভাবনা সে রাজ্যের ত্রিসীমানার বাইরে। বোন বলে, যেখানে খুশি চ'লে যেতে পারে তার ডাক্তার, এমন কি তাকে ফেলে

রেখেও! সে সুখী হ'লেই হয়। যা হয়েছে, সেই তার নিজের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রত্যেকবারই ডাক্তার এসে তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে, কাছে থেকেই তাকে দুধ ও ব্রাণ্ডি খাইয়ে দেয়। আজো সে তার দেহটা পরীক্ষা ক'রে নিজহাতেই একগ্লাস দুধ খাইয়ে দিল।

"এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে!"—গ্লাসটা হাত থেকে নিয়ে বললো সে—"এখন থেকে বেশী কথা বলতে পারবে না; দিনরাতই তো খই ফুটছে তোমার মুখে। একটু চুপ ক'রে থাকবে তো।"

বোন হাসছিল। এবার ডাক্তার এল রাদিশের ঘরে, আমি ছিলাম সেখানে। আমার ঘাড়ে সে সস্নেহে একটা চাপড় মেরে রোগী রাদিশের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললো,—

"কেমন আছো বুড়ো?"

"দেখুন,"—রাদিশ আস্তে আস্তে বলছিল—"দেখুন, আমার একটা নিবেদন আছে। মানুষের ধর্মভয়ও তো আছে একটা······ সবাইকেই তো মরতে হবে···খাঁটি কথা বলি যদি···স্বর্গে স্থান হবে না আপনার।"

"তা কি আর করা যাবে?"—বিদ্রূপভরেই উত্তর দিল ডাক্তার—"নরকেও তো থাকতে হবে কাউকে! জায়গাটা একেবারেই শূন্য প'ড়ে থাকবে, কি বলো?"

হঠাৎ আমার চেতনার মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল; সে যেন এক দুঃস্বপ্ন!—শীতের রাতে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি কসাইখানার আঙিনায়, পাশেই দুর্গন্ধ-দেহ প্রকোফি। এই দুস্বপ্ন থেকে জেগে উঠবার জন্যে চোখ রগড়ালাম, তবু মনে হ'ল আমি এবারে যেন গভর্ণরের সংগে দেখা করতে যাচ্ছি। এরকম বিভ্রান্ত দশা আজ পর্যন্ত

আমার কোনোদিনই হয়নি তো! এই সব অদ্ভুত অবচেতন স্মৃতির আনাগোনা—সম্ভবত আমার স্নায়ুর ক্লান্তি বশতই হবে।

এই দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখি, আমি আর ঘরে নেই, রাস্তায়, —ডাক্তারের সংগে দাঁড়িয়ে আছি একটা ল্যাম্প-পোষ্টের কাছে।

"সত্যিই খুব দুঃখের কথা, খুবই দুঃখের!" ডাক্তার বলছিল, তার গাল বেয়ে নামলো দুটি অশ্রুধারা। "হাসিখুশিতেই আছে তোমার বোন, প্রাণে জেগে আছে আশা, কিন্তু তার অবস্থাটা সত্যিই কী করুণ! তা বুঝতে পারো। তোমাদের রাদিশ ঘৃণা করে আমাকে, বলতে চায় যে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করিনি আমি। তার দিক থেকে ঠিকই বলেছে সে, কিন্তু আমারও তো একটা দিক আছে। এইসব স্মৃতি কখনো ভুলতে পারবো না আমি। ভালো না বেসে কেউ পারে না; ভালোবাসা উচিত, বলুন উচিত নয়? ভালোবাসা ছাড়া জীবনই যে নিরর্থক। যে ভালোবাসাকে মনে করে বিপদের মতো, এড়িয়ে চলে ভালোবাসাকে, সে কখনই স্বাধীন নয়।"

ক্রমে ক্রমে এল সে অন্য প্রসংগে, বলতে লাগলো বিজ্ঞানের কথা—তার ডাক্তারী প্রবন্ধটা পিটার্সবার্গে খুবই প্রশংসা পেয়েছে—সেই সব কথা। নিজের কথা নিয়ে ভেসে চললো সে,—আমার বোন, বা আমি, বা এই একটু আগের তার নিজের ব্যথা—এর কিছুই আর তার মনে রইলো না। তার কাছে জীবনটা হ'ল অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার! মাশারও আছে সাধের আমেরিকা, আর আংটির উপরে খোদাই করা তার জীবনবাণী: "সবই চলে যায়।" ডাক্তারের আছে ডিগ্রী আর প্রফেসরের সম্মানের আসন। কিন্তু আমি আর আমার বোনই প'ড়ে থাকবো পুরোনো দিনের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে, একা একা অসহায়!

ডাক্তারকে বিদায় জানিয়ে ল্যাম্প-পোষ্টের কাছে এসে আবারো পড়তে লাগলাম তার চিঠিটা। আর ছবির মতো মনে পড়তে লাগলো সব। সেদিন বসন্ত-প্রভাতে আমার কাছে 'মিলে' এল মাশা, শুধু জ্যাকেটটা গায়ে দিয়েই শুয়ে রইলো আমার পাশে। তখন দেখাচ্ছিল তাকে কিষাণ মেয়েলোকের মতোই সহজ সরল। আর একবার ভোরবেলা নদী থেকে জাল টেনে তুললাম দুজনে মিলে, নদীর পাশের উইলো গাছ থেকে গায়ে শিশির পড়তে লাগলো টপ্ টপ্ ক'রে, আর হাসছিলাম আমরা……

গ্রেট দ্বারিয়ানস্কি ষ্ট্রীটে আমাদের বাড়ীটা অন্ধকার। ছোটবেলার মতোই পিছন দিক দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে এলাম রান্নাঘরে, সেখান থেকে একটা আলো নিতে হবে। কেউ নেই। বাবার প্রতীক্ষায় ষ্টোভটা হিসহিস্ করছে শুধু। কে এখন বাবাকে চা বানিয়ে দেয় ?—বাতিটা নিয়ে চালা ঘরটায় এসে পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে একটা বিছানার মতো বানিয়ে নিলাম। আগের মতোই দেয়ালের হুকগুলি জেগে আছে নিষেধ অঙ্গুলির মতো, তাদের ছায়া কাঁপছে দেয়ালে দেয়ালে। হিমার্ত রাত। আমার বোন এখনি রাতের খাবার নিয়ে আসবে, কিন্তু তখনি হঠাৎ মনে পড়লো, রুগ্নদেহে প'ড়ে আছে সে রাদিশের ঘরে। কী আশ্চর্য, দেয়াল টপকিয়ে এসে শুয়ে আছি এই ঠাণ্ডা চালা ঘরে! সমস্ত কিছুই যে আমার চোখের সামনে গোল পাকিয়ে গেছে।

রান্নাঘরের ঘণ্টা বেজে উঠলো ঠং ঠং! ছোটবেলা থেকে কতবার শুনেছি! আখিন্যা আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললো।

"আমাদের খোকা, মাণিক। ওঃ ভগবান!"—জানলার কাছে ভোদকায়-ভিজানো জাম কলসীতে ভরা। পুরো এক কাপ নিয়ে পিপাসার চোটে এক চুমুকেই সব গিলে ফেলে আখিন্যার হাতে দিলাম।

ঝকঝকে পরিষ্কার রান্নাঘর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছিল। ঐ গন্ধ আর ঝিঁঝির ঝংকার ছোটবেলায় আমাদের টেনে নিয়ে আসতো রান্নাঘরে, মনে তখন জ'মে উঠতো রূপকথা শোনার নেশা।

"ক্লিওপাত্রা কোথায়!"—আখিন্যা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, দম যেন তার রুদ্ধ হয়ে এসেছে—"তোমার মাথায় টুপি নেই কেন? তোমার বৌ নাকি পিটার্সবার্গে?"

আমাদের মায়ের সময়ের ঝি এই আখিন্যা,—একসময় ক্লিওপাত্রাও আমাকে চান করাতো, খাওয়াতো। তার কাছে এখনো আমরা যেন সেই ছেলেমানুষ, আমাদের একটুখানিক ভালোমন্দ নিয়ে সে কত দুশ্চিন্তা করতে থাকে। এই নিঝুম নিঃসংগ রান্নাঘরে ব'সে সে বলতে লাগলো তার এতদিনকার কত ভাবনার কথা! সে বলছিল যে ডাক্তারকে বাধ্য করা যায় ক্লিওপাত্রাকে বিয়ে করতে, শুধুমাত্র ভয় দেখাতে হবে আচ্ছা রকম। বিশপের কাছে ঠিক মতো আবেদন করতে পারলে প্রথম বিয়েটা তিনি বাতিল ক'রে দেবেন। তারপর, দ্যুবেত্‌স্নিয়াটা বিক্রী ক'রে দেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ,—বৌকে জানানো বোকামি মাত্র। এবং টাকাটা আমার নিজের নামেই জমা রাখা উচিত ভালো একটা ব্যাঙ্কে। তারপর বললো যে, আমি আর আমার বোন যদি বাবার পায়ে প'ড়ে ঠিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারি, তিনি হয়তো ক্ষমা করতে পারেন।…ভগবানের কাছে এজন্যে আমাদের একবার প্রার্থনা করা উচিত।

"এসো বাছা! ওঁর কাছে গিয়ে বলো।"—বাবার কাশি শুনতে পেয়েই বললো সে—"যাও বলো গে সব, মাথা নুইয়েই প্রণাম ক'রো, মাথাটা তাতে খ'সে পড়বে না।"

ভেতরে এলাম। টেবিলে ব'সে বাবা একটা গ্রীষ্মবাসের নক্সা

আঁকছিলেন। ছোট তার জানালা, চুড়োটা অদ্ভুত রকম বিশ্রী। সামনে এগিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আঁকাটা দেখছিলাম। বাবার কাছে কেন যে এসেছিলাম জানি না, কিন্তু মনে ছিল তাঁর সেই শুষ্ক মুখ, শীর্ণ গলা। দেয়ালের উপরে তাঁর রুগ্ন ছায়া দেখে বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠলো, ইচ্ছা হ'ল বাবার গলা জড়িয়ে ধরি, পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাই,—কিন্তু তাঁর গ্রীষ্মাবাসের অন্ধ জানালা ও বিশ্রী চিলেকোঠা দেখেই আমি থেমে গেলাম।

"ভালো আছেন ?"

আমার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি আবার তাঁর চিত্রাংকনে মন দিলেন। "কি চাও এখানে ?"—একটুকাল পরে জিজ্ঞেস করলেন।

"বোনের খুব অসুখ, বেশীদিন আর বাঁচবে না।"—আমার গলার স্বর শোনাচ্ছিল কেমন ফাঁপা।

"আচ্ছা !'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলের উপর—' যেমন কর্ম তেমন ফল।" 'যেমনি কর্ম'—এবার দাঁড়িয়ে উঠে আবারো বললেন—'তেমন ফল'। ঠিক দুবছর আগে তুমি এসেছিলে একবার এবং ঠিক এখানে ব'সেই তোমাকে অনুরোধ ক'রে বলেছিলাম তোমার ভুল শোধরাতে। মনে করিয়ে দিয়েছিলাম তোমার কর্তব্য, তোমার মর্যাদা, তোমার বংশের মান-সম্মান, সেই পবিত্রধারা রক্ষা করার জন্য তোমার দায়িত্ব। শুনেছিলে আমার কথা ? ঘৃণাভরে পায়ে ঠেলেছো উপদেশ, গোঁয়ারের মতো মেতে রয়েছো নিজের মিথ্যা মতবাদ নিয়ে। সবচেয়ে সাংঘাতিক, তুমি তোমার বোনকে পর্যন্ত অধঃপাতে টেনে নামিয়েছ। তোমার সংসর্গে খুইয়ে দিয়েছো তার নীতিবোধ, তার লজ্জা-সরম। দুজনে মিলেই নেমেছো এখন অধঃপাতের পথে। দেখতেই পাচ্ছো, যেমন কর্ম তেমন ফল।"

বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করছিলেন। সম্ভবতঃ, তিনি ভেবেছিলেন যে আমি তাঁর কাছে অপরাধ স্বীকার করার জন্যেই এসেছি, তাই প্রথমেই ক্ষমা চাইবো আমার ও বোনের জন্য। ঠাণ্ডায় ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল সারা দেহ, ভাঙা গলা ধ'রে আসছিল, বললাম—

"আপনাকেও অনুরোধ করছি, মনে ক'রে দেখুন। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়েই আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে ভুল বুঝবেন না। বুঝে দেখুন, আমাদের জীবনের কী উদ্দেশ্য? কিন্তু তার উত্তরে আপনি শুধু বলতে লাগলেন পূর্বপুরুষদের কাহিনী। কবে কোন ঠাকুর্দা লিখতেন কবিতা, আরো কত কী! আজো আমি নিবেদন করছি—আপনার একমাত্র মেয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অথচ আজো আপনি আবৃত্তি ক'রে চলছেন সেই সব পূর্বপুরুষের জীবন কাহিনী! আপনি যথেষ্ট বুড়ো হয়েছেন, মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে সামনেই, বাঁচবেন তো বড় জোর পাঁচ কি দশ বছর,—কিন্তু আপনার এই বয়সে এরকম ছেলেমানুষি মোটেই শোভা পায় না।"

"এই জন্যই কি আসা হয়েছে?"—কঠিনভাবেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন; স্পষ্টতই, আমার ভর্ৎসনায় তিনি আহত হয়েছেন।

"সে জানিনে আমি, আপনাকে ভালোবাসি আমি, সত্যিই আমি একান্ত দুঃখিত যে আমরা আলাদাভাবে বাস করছি;—তাই আপনার কাছে এসেছি। আমি আপনাকে এখনো ভালোবাসি, কিন্তু আমার বোন আপনার সংগে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। আপনাকে ক্ষমা করেনি সে, করবেও না। আপনার নাম শুনলে পর্যন্ত সে অতীত জীবনের উপরে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।"

"সে জন্য দায়ী কে?" বাবা রাগে গর্জে উঠলেন,—"সবই তোমার গুণ, বদমাস।"

"বেশ, মেনে নিলাম সে আমারই দোষ।"—বললাম, "সবদিক দিয়েই আমি ভৎ'সনার যোগ্য। কিন্তু আপনার এই জীবন, যে জীবনের ভার আমাদের উপরেও চাপাতে চান আপনি—তাই বা কেন এত ম্লান, এত ব্যর্থ? কী ক'রে এমনটা সম্ভব হ'ল যে, গত ত্রিশ বছর ধ'রে যতগুলি বাড়ী আপনি তৈরী করেছেন তার মধ্যে এমন একটা মানুষ জন্মালো না যে বোঝে জীবনের অর্থ, দেখাতে পারে জীবনের পথ। একটিও সৎলোক নেই সারা এই শহরে। আপনার তৈরী এই বাড়ীগুলি হ'ল শয়তানের আস্তানা;—যেখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মা ও মেয়েরা, উৎপীড়িত হচ্ছে শিশুর দল···মা, হায়রে মা আমার!"—হতাশভরে বলছিলাম, "হতভাগী বোন আমার! চারদিকেই ভোদকা, তাসপাশা আর কুৎসা। সারা জীবন এরই মধ্যে থাকতে হবে, হতে হবে জোচ্চোর বদমাস;—অন্যথায় বছরের পর বছর নিশ্চিন্তে এঁকে যাওয়া নক্সার পর নক্সা,—যাতে নজরে না পড়ে সমস্ত বাড়ীর অন্তরালে জমা রয়েছে কী বিষাক্ত ক্লেদস্তূপ! একশো বছরের এই শহর,—অথচ এর মধ্যে এমন একটা লোক জন্মালো না যে দেশের কাজে লাগবে। না, একটিও নয়। প্রাণের একটুখানি দীপ্ত চেতনা দেখলেই তা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্মম ফুৎকারে। এ শহর তো দোকানদার, মাতাল নেশাখোর, ট্যাক্স-আদায়কারী, কেরাণী আর জোচ্চোরের শহর। অপদার্থ, একটা অনর্থক শহর,—আজই যদি এই সমস্ত কিছু মাটির তলে নিশ্চিহ্ন হয় তো দুনিয়ার একটি প্রাণীও সেজন্য আফশোষ করবে না।"

"তোমার এসব বক্তৃতা শুনতে চাই না, শয়তান"—বাবা টেবিল থেকে রোলারটা তুললেন—"তুমি মাতাল, ফের কখনো এ অবস্থায় দেখা করতে আসবে না। এই শেষবারের মতো ব'লে দিচ্ছি,—তোমার সেই

ভ্রষ্টা বোনটাকেও বলবে—আমার কাছ থেকে এক কপর্দকও পাবে না তোমরা, তুমিও না, তোমার বোনও না। আমার অন্তর থেকে আমি উপড়ে ফেলেছি অবাধ্য সন্তানদের। তাদের অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমির জন্য যদি তারা দুর্ভোগ ভোগে তো দুঃখ নেই আমার। যাও, চ'লে যাও, যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই চ'লে যাও। তোমাদের দিয়ে ভগবান আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, কিন্তু আমিও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো একান্ত আত্মসমর্পণে,—ঠিক ঋষিদের মতোই সান্ত্বনা পাবো আমার নির্যাতন ও কঠোর পরিশ্রমের ভেতর! খাঁটি লোক আমি,—যা বলেছি তোমাদের কল্যাণের জন্যই। নিজের ভালো চাও তো—চিরজীবন মনে রাখবে আমার এই প্রত্যেকটি কথা……!"

মর্মান্তিক হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে চ'লে গেলাম। পরে যে কী হয়েছে আমার সে জানি না,—সেই রাতে ও তার পরের দিন।

আমি নাকি খালি পায়ে খালি গায়ে টলতে টলতে চলছিলাম রাস্তা দিয়ে, পাগলের মতো গান গাইতে গাইতে। আর পেছন থেকে তাড়া করেছিল একদল ছেলে,—

"এই নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা, এই!"

(কুড়ি)

আমার যদি একটা আংটি বানাতে ইচ্ছে হ'ত তবে তার উপরে আমি খোদাই করাতাম এই কথাটা: "হারায় না কোনো কিছু।" আমার বিশ্বাস একটা ছাপ না রেখে কিছুই মুছে যায় না,—আমাদের প্রত্যেকটি ছোট ছোট পা-ফেলাও এগিয়ে আছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎজীবনের মুখে।

বৃথা হয়নি আমার এতদিনের পথযাত্রা। আমার দুঃসহ দুঃখ ও অসীম ধৈর্য গিয়ে স্পর্শ করেছে সবারই প্রাণ; এখন আর তারা আমাকে “নাই-মামার-চেয়ে-কাণা-মামা” বলে না, বিদ্রূপ করে না, দোকানের পাশ দিয়ে যাবার কালে ছুঁড়ে দেয় না ময়লা জল। আমার শ্রমিক জীবন দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা। আমি যে অত্যুচ্চ ‘নোবল’ পরিবারের লোক হয়েও রঙের বাল্‌তি ব’য়ে নিয়ে কাজ করি—এতে এখন আর তাদের বিস্ময় জাগে না। বরং, সবাই আমাকে কাজ দিতে পারলেই খুশি হয়। ভালো শ্রমিক আমি; রাদিশের পরেই আমার স্থান,—রাদিশ এখনো গম্বুজ রঙ্‌ করতে পারে বিনা মাচায়ই, কিন্তু শ্রমিকদের উপযুক্ত হাতে চালাবার শক্তি এখন আর তার নেই। তার বদলে আমিই এখন কাজের খোঁজে ফিরি শহরের মধ্যে, মজুরদের কাজে লাগাই, মজুরী দেই আমিই, টাকা ধার করি চড়া সুদে। আমি নিজেই কণ্ট্রাক্টর ব’লে এখন ঠিক বুঝি—পাঁচ-সাত টাকার কাজের জন্যও কেমন ক’রে টালিদার-মজুর খুঁজে ফিরতে হয় পূরো তিনদিন ধ’রে। সবাই এখন আমার কাছে ভদ্র, ভদ্রভাষায়ই আমাকে ডাক দেয় তারা, এবং যে সব ঘরে কাজ করতে যাই, তারা আমাকে চা এনে দেয়,—দুপুরে খেতে পারবো কিনা, তাও জিজ্ঞেস করে এসে। ছোট ছোট শিশুরা ও কুমারী মেয়েরা প্রায়ই আসে আমার কাছে, তারা উৎসুক দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখে কেমন করুণাভরে।

একদিন কাজ করছিলাম আমি গভর্ণরের বাগানে; একটা কুঞ্জের মাঝখানটা রঙ্‌ করতে হবে মার্বেলের মতো ক’রে। গভর্ণর হাঁটতে হাঁটতে বাগানে এসে আমার সংগে আলাপ করতে লাগলেন। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তিনিই একবার আমার নামে শমন পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার মুখের দিকে হাঁ ক’রে তাকিয়ে রইলেন,—

"না, মনে পড়ছে না তো!"

অনেক বয়স হয়েছে এখন। আজ আমি স্থির শান্ত মানুষ; উচ্চকণ্ঠে হাসি না এখন আর। আমিও নাকি রাদিশের মতো হয়ে গেছি,—শ্রমিকদের সংগে নাকি খিটখিটে ব্যবহার করি।

মেরিয়া ভিক্টরভ্না, আমার একদিনকার স্ত্রী, আছে এখন বিদেশে;—তার বাবা বাড়ী তৈরী করছেন বিরাট এক রেললাইন কোথায় কোন পূর্বদেশে, জমিদারীও নাকি কিনেছেন সেখানে। ডাক্তার ব্লাগোভাও বিদেশে। দ্যুবেত্স্নিয়া আবার ফিরে এসেছে মাদাম শেপ্রাকভের হাতে, কায়দা ক'রে তিনি শতকরা বিশটাকা কম দামেই এঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কিনে রেখেছেন। মোয়েজি একটা টুপি প'রে আজকাল ঘুরে বেড়ায়, ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে সে শহর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসে মাঝে মাঝে, জিবিয়ে নেয় নদীর পাড়ে। ইতিমধ্যেই সে নাকি অনেকটা মরগেজী জায়গা কিনে ফেলেছে,—দ্যুবেত্স্নিয়ার বিষয়েও নাকি খোঁজ-খবর নেয়। তার মানে, সেটাও কিনবার মৎলব। বেচারা আইভান বেকার ছিল বহুদিন। মদ খেয়ে খেয়ে টলতো শুধু, আমি তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলাম, আমার সংগে সংগে ছাদে কিছুদিন রঙ্ও করেছিল। এ কাজ বরং ভালোই লাগতো তার, তেল চুরি করতে পারতো ইচ্ছামতো, আর মদও খেতো সাধ মিটিয়ে। কিন্তু, কিছুদিন পরে সব ছেড়ে দিয়ে সে চ'লে যায় দ্যুবেতস্নিয়াতে এবং সেখানে নাকি কিষাণদের হাতে এনে স্থির করে,—মোয়েজিকে সাফ খুন ক'রে মাদাম শেপ্রাকভের ঘরে ডাকাতি করবে। পরে একথা কিষাণরা নিজেরাই বলেছে আমাকে।

বাবা খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কুঁজো হয়ে গেছেন; সন্ধ্যেবেলা

বাড়ীর ধারে তিনি ধীরে ধীরে পায়চারি করেন আজো। আর কখনো আমি তাঁকে দেখতে যাইনি।

কলেরার প্রকোপের সময় প্রকোফি কয়েকজন দোকানদারকে লতা-পাতা ওষুধ খাইয়ে টাকা মেরেছিল কিছুটা। পত্রিকায় পড়েছি,—সে বেতও খেয়েছে ডাক্তারদের জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করার জন্যে। তার ছেলে নিকোলকা মারা গেছে কলেরায়। কার্পোভ্‌না বেঁচে আছে আজো; আগের মতোই সে তার ছেলেকে ভালোবাসে, ডরায়ও খুব! আমাকে দেখলে সে মাথা নাড়তে থাকে করুণ হতাশায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :

"তোমার জীবনটাই মাটী হয়ে গেল।"

রবিবার ছুটির দিন, সেদিন ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই ব্যস্ত থাকি নানা কাজে। ছুটির দিনে আকাশ যদি উজ্জ্বল থাকে,—আমার ছোট্ট বোনঝিটিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে আসি বোনের কবরভূমিতে! (বোন ভেবেছিল তার ছেলে হবে, কিন্তু হয়েছে মেয়ে।) সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি বা ব'সে পড়ি, অপলক চোখে তাকিয়ে থাকি আমার প্রাণের প্রিয় বোনের কবরটির দিকে,—খুকীকে দেখিয়ে দিই, ওইখানে নীরব শান্তিতে ঘুমুচ্ছে তার মা।

কখনো বা কবরের পাশে দেখি অনীতাকে; দুজনেই দুজনের নাম ধ'রে ডাক দিয়ে এগিয়ে আসি কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকি নীরবে; কখনো বা ক্লিওপাত্রা বা তার খুকীর কথা আলোচনা করতে থাকি, ভাবি ব'সে দুনিয়ায় কত দুঃখ, কত ব্যথা। তারপর, কবর থেকে বাইরে এসে নীরবে হেঁটে চলি আমরা, অনীতা ইচ্ছা ক'রেই খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে, আরো একটুকাল আমার পাশে থাকবার জন্যেই। ছোট্ট খুকীটি হাসতে হাসতে অনীতার হাত

ধ'রে টানতে থাকে, সোনালি সূর্যালোকে নির্মল চোখদুটি কুঁচকে তুলে তাকায় সে কেমন সুন্দর ! দেখতে দেখতে আমরা থেমে দাঁড়াই, দু'জনে মিলে খুকীকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি।

শহরের প্রান্তে এসে পৌছলেই অনীতা ব্লাগোভো সহসা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, লাল হয়ে ওঠে তাঁর মুখখানি, আমাকে ভদ্র ভঙ্গীতে নমস্কার জানিয়ে হেঁটে চলে একেলা। স্থির সংযত, মর্যাদাময় তার সে রূপ !

……পথে কেউ তাকে দেখে ভাবতেও পারেনা যে এইমাত্রই সে আমার পাশাপাশি হেঁটে বেড়াচ্ছিল, এমনকি খুকীকে বুকে নিয়ে চুমোও খাচ্ছিল বারবার।

-সমাপ্ত—